2/85

PRESENTED

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

শ্রীশিবেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম. এ.

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

2/85

Bhadaini, Varanasi-1

No. 6/28 6

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

20.8.77

2/85

নিবেদন

আমার এই ছোট বইটুকুর ভূমিকা নাই—আছে নিবেদন ও কৃতজ্ঞতা। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পুরাতন যুগের ভাঙ্গা ইট, পাথর নিয়া গবেষণা ও ইতিহাস রচনা করেন। আমি যাহা লিখিলাম উহা আমার ভগ্নস্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিলাম। সুতরাং এই লেখার উপর আমার কল্পনার ছাপ পড়ে নাই একথা বলা সাজে না। আর সর্ব্বতোভাবে উহা বর্জ্জন করিতে গেলে লেখাও অচল হইয়া পড়ে।

এই বই-এর ৪র্থ, ১০ম, ১১শ ও ১২শ ব্যতীত বাকী ৮টি প্রবন্ধ ভোলানন্দ সেবামণ্ডল পরিচালিত ও বহু আদৃত মাসিক পত্রিকা "শিবম্" এ প্রথম প্রকাশিত হয়। যে কোন কারণেই হউক ৪র্থ, ১০ম, ১১শ প্রবন্ধ ত্রয় শিবম্ কর্তৃপক্ষের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই এবং সে জন্য আমার ক্ষোভও নাই। সেখানে আমি যে উৎসাহ, উদ্দীপনা পাইয়াছি উহা চিরস্মরণীয়। এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আমি যে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট কৃতজ্ঞ তিনি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের পটখানি পরিবেশন করিয়াছেন।

এই বই এর প্রথম চারটি প্রবন্ধ নিয়া যে ক্ষুদ্র পুস্তক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল উহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল দিল্লীর মনোজদার স্মৃতিতে যিনি আমার মাকে সবাই দেখুক এই বুদ্ধিতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অপরকে মায়ের নিকট আগাইয়া দিতেন। অবশিষ্ট আটটি প্রবন্ধ উৎসর্গীকৃত হইল তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যাহাদের স্মৃতি এই পুস্তকের ভিতর ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত আছে।

তারপর আমার সর্ব্ব কর্ম্ম বা সাধনার ফল নিবেদিত হইল শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে।

শ্রীশ্রীমায়ের অশীতিতম জন্ম-জয়ন্তী দিবসে
১৯শে বৈশাখ ১৩৮২ সন (ইং ৩।৫।৭৫)
শ্রীশিবেন্দ্র নাথ ঘোষ।

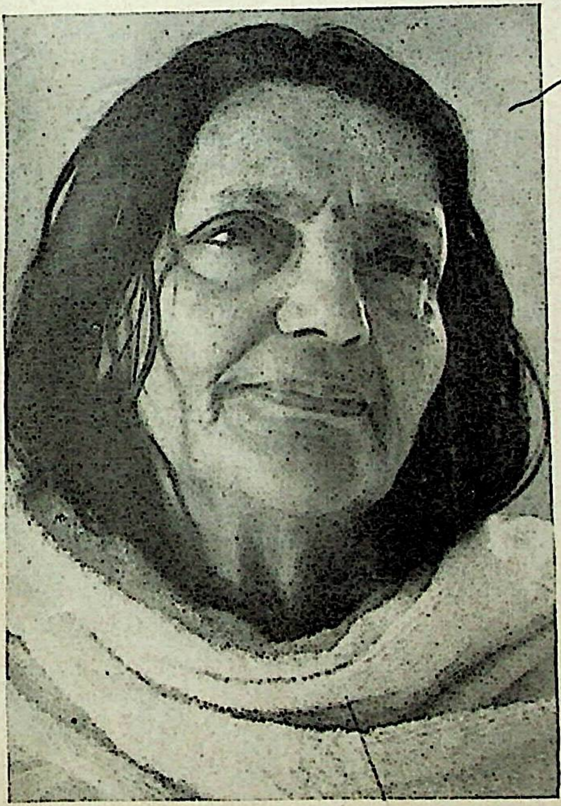

2/85
6/67
PRESENTED
LIBRARY
No....

মা আনন্দময়ী

(১)

মায়ের মাতৃত্ব আমার মত কতগুলি অপোগণ্ড শিশু সন্তান নিয়া। ধূলাবালি মাখা এই vagabond ছেলেগুলির ভোটাধিক্যে মা নাম কিনিয়াছেন পতিতপাবনী। সে কথা মাও জানেন, আমিও জানি। সুতরাং আমি মায়ের কথা বলিতে যাইতেছি বলিয়া কেহ দোষারোপ করিতে গিয়া সুবিধা করিতে পারিবেন না। বিচারালয়ে মোকর্দ্দমা টিকিবে না।

১৯৩৭ খ্রীঃ আমি মায়ের প্রথম দর্শন লাভ করি দিল্লীতে; বলিতে গেলে ঘরের দরজায়। তাহার পর বহুস্থানে বহুবার দর্শন মিলিয়াছে। মায়ের দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য—প্রত্যেক দর্শনটি-ই নিত্য ও নূতন। নানা কারণে ~~ও স্থানাভাবে~~ সে সকল ঘটনা একত্রে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে একটি একটি করিয়া লিখিলেও মূল প্রবন্ধের অঙ্গহানি হওয়ার আশঙ্কা নাই। তাই আজ যথাসম্ভব ছোটখাট করিয়া আমি আমার একটি বন্ধুর কথা বলিতে চাই— কেমন করিয়া তাহার জীবন ধন্য হইয়াছিল মায়ের করুণা স্পর্শে। আমার এই মরমী বন্ধুটির নাম পিনাকপাণি চ্যাটার্জি। মনে হয় তিনিই পরপার হইতে আজ আমাকে এ প্রবন্ধ লিখিতে উৎসাহিত করিতেছেন।

পিনাকবাবু বলিয়াছেন—

আমার বাড়ী খাস্ নবদ্বীপে, কিন্তু হরিনামের কেচকেচানিতে ভূতে পাওয়া মানুষের মত অস্থির হইয়া ধাম ছাড়িয়া দিল্লীতে বসবাস

করিতেছি। স্বভাব যায়না ম'লে—তাই এখনও বৈষ্ণব সাধু দেখিলে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ তাহার টিকি ধরিয়া একটি নাড়া দিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে।

এক সময় Office-এর কাজ নিয়া জামসেদপুর যাই, জানিনা সে কোন শুভ না অশুভ লগ্নে। আমার বাসার অনতি দূরে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে কয়েকদিন ধরিয়া সমানে পাঠ কীর্ত্তনাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান লাগিয়াছিল। শুনিতে পাইলাম সে বাড়ীতে কোন এক আনন্দময়ীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। মনে করিলাম ভূতের কেচকেচানি ঠাণ্ডা করিয়া দিয়া আসিতে হইবে। উৎসব বাড়ী গিয়া শুনিলাম যাহাকে সায়েস্তা করিতে আসিয়াছি তিনি তখন সমাধিস্থ। আমার বুদ্ধিবিবেচনায় স্থির করিলাম মহিলাটি Hysteria-র রোগী। সে দিন মায়ের সাথে বাক্যালাপের কোন ফুরসৎ মিলিল না—পরের দিন প্রাতে গিয়াও ভগ্নমনোরথ হইলাম, কেননা তখন রোগীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলেও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই।

আবার বৈকালে ধাওয়া করিলাম—আমার মাথায় তখন খুন চাপার মত জিদ চাপিয়াছে। অনেক চেষ্টায় ভক্তদের ব্যূহ ভেদ করিয়া মাকে পাকড়াও করিলাম এবং নানা অকথ্য ভাষায় মাকে বার বার আক্রমণ করিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে শাসন করবার কি কেহ নাই? থাকে ত' তাহার ঘর কর না কেন?" অন্যান্য মন্তব্য যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম উহা আজ মুখে উচ্চারণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। শুনিতে পাইলাম তাঁবুর বাহিরে স্বামী অখণ্ডানন্দজী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ চাপা গলায় বলাবলি করিতেছেন, "বেটা জ্বলে মরবি—আগুণ নিয়া খেলা করিস না ইত্যাদি।" কিন্তু আমি যাহাকে জর্জ্জরিত করিবার জন্য আমার বাছা বাছা শরগুলি নিক্ষেপ করিলাম তিনি তাহাতে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করিলেন না। তিনি তাঁহার স্বভাব সুলভ হাসিমুখে আমাকে বলিলেন, "বাবা! তুমিই তোমার এই পাগল মেয়েটার

শাসন ভার নাও না কেন ?" ভক্তবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের যেমন স্ব স্ব একটা ভাব আছে আমার এই বাবারও তেমন একটা ভাব আছে—গুণের বৈচিত্র্য নিয়াই এই জগৎ। তোমরা রাগ কর কেন ?" মায়ের এই দুইটি কথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম, আঘাত করিলে জড়বস্তুও প্রতিঘাত করে কিন্তু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি তাহার বিনিময়ে আততায়ীকে স্নেহময় বক্ষে টানিয়া নেন তিনি মানবী না দেবী !

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥

গীতা ১৮।১০

সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মেধাবী (তত্ত্বজ্ঞ) অতএব সংশয়হীন, ত্যাগী দুঃখকর কার্য্যে দ্বেষ করেন না, সুখকর কার্য্যেও প্রীতি বোধ করেন না (অনুরক্ত) হন না।

আমার বাল্যকালে দেখিয়াছি কোন নবাগত নবদ্বীপে আসিয়া জগাই-মাধাই এর বাড়ী খোঁজ করিলে পাড়াপর্শী আমাদের বাড়ী অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিতেন। মনে করিলাম তাই যদি সত্য হয় তবে উত্তরাধিকারী সূত্রে আমি মায়ের দয়ার যোগ্য পাত্র। যা' হ'ক সেদিন মায়ের সঙ্গে আমার আর তেমন কোন কথা হইল না। সায়েস্তা হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। অনুশোচনায় রাতে ঘুম হইল না। পরের দিন প্রাতে গিয়া দেখিলাম মায়ের জিনিস পত্র গুছান হইয়াছে ; যানবাহন তৈরী, মা বিদায়ের জন্য প্রস্তুত। আমি ভিড় ঠেলিয়া গিয়া মাকে বলিলাম, মা আজকের দিনটা এখানে থাকিয়া যাও।" মা দেখাইয়া দিলেন বাবা ভোলানাথকে। ভোলানাথ ভোলানাথই বটে ; তিনি বিনা ওজর আপত্তিতে আমার কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। বাঁধা বিছানা খোলা হইল, যান-বাহন বিদায় নিল। সারাদিন ধরিয়া মাকে দেখিলাম কিন্তু দেখার সাধ আমার মিটিল না। তবে মায়ের ছায়ায় সেদিন যে আনন্দ

উপভোগ করিয়াছিলাম উহা ছিল আমার জীবনের প্রথম বিমলানন্দ ভোগ। মায়ের বিদায় কালেও চির শুকনো হৃদয়টা কেন যেন ভিজা ভিজা বোধ হইতেছিল।

কয়েক বছরের পরের কথা, মায়ের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ মিলিল কলিকাতায়। আমি আমার পূর্ব্ব সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া মাকে আমার জীবনের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি অকপটে খুলিয়া বলিলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আমার মত পাপীর কোন গতি হইতে পারে কি?"

মা—পারে বৈকি। ভগবানের নাম কর। তুমি নবদ্বীপের লোক—শুন নাই কি মানুষের সাধ্য কি এমন পাপ করে যাহা ভগবানের নামে ভস্মীভূত না হয়।

নাম্নোস্য যাবতী শক্তিঃ পাপ নির্হবনে হরেঃ।
তাবৎকর্তুংন শক্তঃ স্যাৎপাতকং পাতকী জনঃ॥

(নাঃ পঃ রাত্র)

আমি—মা, ভগবানের নাম আমার মুখে আসেনা ও পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারগুলি করিতে দেয় না। তুমি আমার ভার নাও।

মা—তাহা কি করিয়া হয় বাবা! একে অন্যের ভার নেয় কি করিয়া?

আমি—পরমহংসদেব যে গিরীশ ঘোষের ভার নিয়েছিলেন।

মা—বাবা। জগতের পরমহংসদেব বা কয়টি এবং গিরীশ ঘোষই বা কয়টি।

আমি—একবার পরমহংসদেবের আবির্ভাব হইলে দ্বিতীয়বার যে তিনি আসিতে পারেন না সে কথাও ত' বলা চলে না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পিনাকবাবু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমাকে বলিলেন—শিবেনবাবু! মা সম্মতিসূচক ইঙ্গিত জানাইয়া সে দিন হইতে আমাকে ধর্ম্মের ষাঁড় করিয়া দিয়াছেন।

শুনা কথার এইখানেই শেষ। ইহার পর পিনাকবাবু সম্বন্ধে

যাহা বলা হইবে সেগুলি আমার নিজের চোখে দেখা। সুতরাং সে দেখার সুযোগ কি করিয়া আসিয়াছিল তাহার একটু আভাস দেওয়া আবশ্যক বোধ করি।

পিনাকবাবু ও আমি একই Office-এ কাজ করিতাম বটে কিন্তু সে পথে আমাদের বন্ধুত্ব জমিয়া উঠে নাই, জমিয়া উঠিয়াছিল অন্য পথে। একদিন পিনাকবাবুর বাসার সম্মুখ দিয়া বাসায় ফিরিবার পথে দেখিলাম তাহার বাড়ীর বাহিরের ঘরে কীর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছে। অনিমন্ত্রিত হইলেও সে বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলাম অসঙ্কোচে। (ভাগ্য বোধ হয় তখন সুপ্রসন্ন ছিল) পিনাকবাবু কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি বৈষ্ণব না শাক্ত? ঐরূপ প্রশ্নের জন্য আমি মোটেই তৈরী ছিলাম না; উত্তর দিলাম সে সংবাদ আমি আপনাকে দিতে পারিব না। পুনরায় প্রশ্ন—আপনার ইষ্ট কে? উত্তর—গুরুদত্ত নাম। তা'র খুশীতেই আমার খুসি। জানিনা ঐ কথায় পিনাকবাবু কি বুঝিয়াছিলেন। উহার পর হইতেই পিনাকবাবু আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। আমিও কিছুদিন তাহার সাথে মেলামেশা করিয়া লক্ষ্য করিলাম যাহার ভয়ে তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়া আসিয়াছেন তিনি যেন কোন এক সুযোগে পিনাকবাবুর অন্দর মহলে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ঘরের একটি কোণে একখানি ছোট জলচৌকি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আমার মনে কৌতূহল জাগিল—যাহার করুণায় হারান মানিক ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন তিনি কোথায়? পিনাক-বাবুকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় দেয়ালে টাঙ্গানো একখানি pass port size এর ছবি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—ইনিই সেই আনন্দময়ী। ভাল করিয়া দেখিয়া নিলাম সে পট বিগ্রহের মন ভুলান অপরূপ রূপরাশি—চোখ দুইটি ভাসা ভাসা অথচ অতলস্পর্শী, নির্লিপ্ত অথচ নিত্যযুক্ত, উদাস অথচ করুণাবর্ষী। ছায়াকে দেখিয়া কায়াকে দেখার জাগিল এক আকুল আগ্রহ।

সত্য বলিতে কি মায়ের ঐ ছোট্ট ছবিখানি আমাদের দুই বন্ধুর দুইটি প্রাণের যোগসূত্র।

বছর কয়েক পরের কথা। শনিবার ২টার সময় office হইতে বাড়ী আসিয়া খেয়ালবশতঃ ঠাকুর ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলাম, আমার বৌদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হরিসভায় ভাগবত পাঠ শুনিতে যাইবেন কি? উত্তর দিলাম—আপাততঃ ইচ্ছা নাই। ঠাকুর ঘরে বসিয়া একটি একতারা নিয়া গাইতেছিলাম, "এস হে শ্যাম আমার ঘরে।" কি জানি হঠাৎ কোন শ্যাম বা শ্যামার আকর্ষণ অনুভব করিয়া হাতের একতারাটি যথাস্থানে রাখিয়া পৌঁছিলাম গিয়া হরিসভায়। (লাটাই-এর সুতা গুটাইলে উড়ন্ত ঘুড়ির যে দশা হয়)। বিরাট মণ্ডপের এক কোণে ২।৫ মিনিট বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল এক মাতৃ-মূর্তির প্রতি। মনে হইল তিনি যেন আমার কত জন্মের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ও বহু পরিচিতা, কিন্তু সে পরিচয়ের মূল খুঁজিয়া পাইতে-ছিলাম না। ৫।৭ second-র ভিতর Store of knowledge (লুপ্তস্মৃতি) হইতে সংবাদ আসিল—ইনিই তোমার বহুবাঞ্ছিত ধন মা আনন্দময়ী। বুঝিলাম কাহার আকর্ষণ আমাকে ঠাকুর ঘর হইতে এখানে টানিয়া নিয়া আসিয়াছে। কিছু সময় পরে মা তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া পিছু নিলাম। ভক্তবৃন্দের ভিতর আমার পূর্ব্বপরিচিত চারুদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম —এই না মা আনন্দময়ী?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—কোথায় উঠিয়াছেন?

উঃ—পঞ্চুদার বাড়ী।

প্রঃ—আমি সেখানে যাইতে পারি?

উঃ—নিশ্চই—মায়ের দরজা অবারিত।

পঞ্চুদার বাড়ীতে মাকে দেখিয়া যখন বাসায় ফিরিতেছিলাম

তখন রাত অনেক হইয়াছে, লোক বিরল দিল্লীর রাস্তায় আমি ব্যতীত দ্বিতীয় প্রাণী নাই। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার জ্ঞান ফেলিয়াছিলাম হারাইয়া, বাড়ীর কাছে আসিয়াও গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—চলিলাম পিনাকবাবুর বাড়ী ; কেননা তিনি আমার আনন্দের সমান অংশীদার। নিশুতি-রাতে আমার ডাকাডাকিতে পিনাকবাবুর ঘুম ভাঙ্গিল। হকচাকিয়া দরজা খুলিয়া তিনি আমার দিকে ঔৎসুক্য ও উদ্বেগ ভরে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাহাকে মায়ের শুভাগমন বার্ত্তা জানাইলে তাহার ভীত ও চকিত আননে ফুটিয়া উঠিল আনন্দের এক দীপ্তি। Pro-gramme স্থির হইল রাত না পোহাতেই দুজনে মিলিয়া মায়ের নিকট যাওয়া যাবে। এইসময় হইতে আমরা যখনই মায়ের নিকট গিয়াছি দুইজনে মিলিত হইয়াই গিয়াছি কিন্তু আমি পিনাকবাবুকে মায়ের সাথে কখনও তেমন কথাবার্ত্তা বলিতে দেখি নাই। তিনি মাকে প্রণাম করিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতেন ও একটি প্রণাম করিয়া চুপটি করিয়া চলিয়া আসিতেন। তিনি বলিতেন মায়ের দর্শনে, স্পর্শে, কথায় হাসিতে চাহনিতে infectious disease-র মত সত্ত্বগুণের ছোঁয়াচ লাগিয়া যায়—কথা বলিব কি মশায়।

পিনাকবাবুর প্রবল বাসনা পঞ্চুদার বাড়ী থাকিতে থাকিতে মাকে একবার তাহার বাড়ী নিয়া আসেন। পঞ্চুদার বাড়ী খুব কাছেই, এ সুযোগ কাজে না লাগাইতে পারিলে এরূপ সুযোগ কখন আসিবে কিনা কে জানে। তবু পিনাকবাবু সম্পূর্ণ সাহস পাইতেছেন না কেননা মার ছেলে মেয়ে অনেক ও নানা ভাবের। তাহাদের পদমর্য্যাদাও একটা ভাবনার বিষয়। ব্রাহ্মণ দম্পতি অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন মাকে তাহারা নিয়া আসিবেনই—মা তার ছেলে মেয়েদের নিয়া আসেন ত তিনিই তাহাদিগকে সামলাবেন। পিনাকবাবু গিয়া মাকে তাহার প্রার্থনা জানাইলেন, মাও এইটুকুর জন্য অপেক্ষমানা ছিলেন। স্থির হইল পরের দিন

বৈকালে মা পিনাকবাবুর বাড়ী আসিবেন। স্বামী স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের আনন্দ ধরে না। (পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ) পিনাকবাবুর স্ত্রী লাগিয়া গেলেন ধূপদীপ, কাঁসর ঘণ্টা, ঘট, ফুল, চন্দন, শাঁখা-সিঁদুর শাড়ী ইত্যাদি সংগ্রহার্থে। পিনাকবাবু কিন্তু হইয়া গেলেন দিশাহারা কি করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতে-ছেন না। সামনের ঘরে ও খোলা বারান্দাটায় আমাতে ও পিনাকবাবুতে বহুবার সতরঞ্চি বিছান ও গুটান হইল। কোন প্রকারে সতরঞ্চি বিছান হইলেও মায়ের আসনের জন্য মনের মত কোন জায়গা খুজিয়া পাইলেন না তিনি। ওদিকে মা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া এক ভক্তের মোটরে চাপিয়া অপর ভক্তের গৃহ দরজায় আসিয়া পদার্পণ করিলেন; সঙ্গে মাত্র দুই একটি ভক্ত সেবিকা। অপর যাহারা আসিয়াছিলেন তাহারা আসিয়াছিলেন দর্শক হিসাবে। পিনাকবাবুর অমূলক ভাবনা নিরসন করাই বোধহয় ছিল মায়ের উদ্দেশ্য।

মায়ের হাসি যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা সকলেই জানেন মার হাসি কুড়াইয়া নেওয়ার মত সামগ্রী, অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখার মত নিধি। সেই হাসি নিয়া মা আজ পিনাকবাবুর দরজায় দণ্ডায়মান। পিনাকবাবুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি বরণডালা নিয়া অগ্রসর হইলেন, এমন সময় মায়ের এক ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, "মাকে বসাবেন কোথায়? মা যে কোন গৃহীর বাড়ী প্রবেশ করেন না।" পিনাকবাবুর তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। কি করিবেন, উন্মুক্ত গগনতলে মাকে বসাইবার জন্য কম্বল আসনখানি নিয়া আসিলেন, যাহা বিছাইবার জন্য মনের মত জায়গা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অপরদিক হইতে অন্য ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, "মা অপরের ব্যবহৃত দ্রব্য ব্যবহার করেন না।" গৃহস্বামী একেবারে নিরুপায় মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন (এইটিই বোধহয় ভগবানের ধুইয়া নেওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়)।

হঠাৎ কি খেয়াল হইল দৌড়িয়া গিয়া নিতাইগৌর পটবিগ্রহখানি

মেঝের উপর রাখিয়া সেই জলচৌকিখানি আনিয়া মাকে বসিতে দিলেন, মা আসন পরিগ্রহ করিলেন। ভাবিয়া দেখিলাম ঐ আসন-খানি দখল করিবার জন্য মায়ের এত কাণ্ড ও পিনাকবাবুর বাড়ীতে আসা। মায়ের এই অপার করুণার আমি দ্রষ্টা; ভোক্তাও বটে।

এই সময় হইতে মা ঘন ঘন কয়েকবার দিল্লী আসেন এবং মা আসিলেই পিনাকবাবু বলিতেন, মা, শুনিয়াছি সাধনভজনের পথ বলিয়া দেন গুরুদেব। কিন্তু আমার যে আজ পর্য্যন্ত গুরুকরণই হইল না।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

মণ্ডুকোপনিষৎ ১।২।১২

তথা নারদ পঞ্চরাত্রে
গুরোশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্র তন্ত্রয়োঃ।
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রঃ স্যাদ্যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ ১।১।১৪

গুরুজ্ঞানদ্বারা মন্ত্র ও তন্ত্রের জ্ঞান জন্মে, এবং মন্ত্র শব্দ বাচ্য হয় এবং তাহাকেই মন্ত্র কহা যায়, যাহাতে অধোক্ষজে ভক্তি জন্মে।

মা প্রথম প্রথম পিনাকবাবুর এরূপ কথায় কোন জবাবই দিতেন না। পিনাকবাবুর বিশেষ আর্ত্তি দেখিয়া একদিন বলিলেন, "সময় হইলে গুরু লাভ হইবে।"

পিঃ—মা এদিকে আমার গোণা দিন যে ফুরাইয়া যায়। ডাক্তার যেমন রোগীকে operation table-এ ফেলিয়া কাঁচা ফোড়ার অস্ত্রোপচার করেন, তেমন কিছু করা যায় না?

মা—যায় বৈকি। কিন্তু সে ব্যথা সইতে পারবি?

এই কথা হওয়ার পর পিনাকবাবু আর কোন দিন সাহস করিয়া দীক্ষার কথা বলিতে পারেন নাই।

সময় বুঝিয়া একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। পিনাকবাবুর স্ত্রী পাঁচকুইয়া রোডের আশ্রমে মায়ের ভোগ রান্নার সাহায্য করিতে

গিয়া একটি মহিলা কর্তৃক রান্নাঘর হইতে বিতাড়িত হইলেন, কেননা তিনি অদীক্ষিতা। স্বামীস্ত্রী দুইজনেই সেদিন গোপনে অঝোরে কাঁদিলেন। যে কারণে হউক মা-ও সেদিন অন্নগ্রহণ করিলেন না। খুকুনী দিদি পিনাকবাবুর আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা অবগত ছিলেন। তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন তাহার পিতা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর নিকট পিনাকবাবু ও তাহার স্ত্রীকে দীক্ষা দেওয়াইবার জন্য। কিন্তু তাহার দুই দুইবারের চেষ্টা বিফল হইল এবং মা-ও তাহাকে এ চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন কে জানিত মায়ের মনে কি আছে? ইহার পর মা একদিন পিনাকবাবুকে আশ্রমে ডাকাইয়া নিয়া বলিয়া দিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে রাধারমণের সেবায়েত শ্রীবনমালী দাস গোস্বামী বা নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর অমুকের নিকট (নামটি বোধহয় দেবকীনন্দন) দীক্ষা গ্রহণ করিতে পার—যাহাতে তোমার অভিরুচি হয়। মা ঐ নির্দেশ দিয়াই দিল্লী হইতে চলিয়া গেলেন। পিনাকবাবু তখন অসুস্থ। তাই আমাকে তিনি সঙ্গী করিয়া নিবার প্রস্তাব করিলেন—আমিও রাজী হইলাম। কিন্তু বাধ সাধিল পিনাকবাবুর ছোট ভ্রাতা পুষ্পবাবু। তিনি তাহার বৌদিকে গিয়া বলিলেন, "তোমার অভিপ্রায়টা কি? দাদা মারা গেলে তাহার life insurance ও provident fund-এর টাকা কয়টি আরামে ভোগ করিবে?" সে কথায় স্বামী ও স্ত্রী কাহার কর্ণপাত করার সময় ছিল না, কেননা শ্যামের বাঁশী যে তখন বাজে। এ পর্য্যন্ত দীক্ষার ব্যাপার সাধারণ গতানুগতির পথেই চলিল। সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল বৃন্দাবন পৌঁছিয়া—কোথায় কাহার নিকট যাওয়া যায়! দুই-এর কাহাকে পছন্দ হইবে না হইবে তাহা ত' পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখার বিষয় নয়। পিনাকবাবুর বাড়ীতে গোপালদাস বাবাজী নামে একটি বৈষ্ণব সাধু আসা যাওয়া ও কীর্ত্তনাদি করিতেন। ইতিপূর্ব্বে আমি একবার তাহার সাথে বৃন্দাবন আসিয়া তাহার গুরুদেবের বাড়ী উঠিয়াছিলাম ও সেখানে

ব্রজমায়ীদের হাতে প্রসাদও পাইয়াছিলাম। গৃহস্বামীর সহিত আমার পরিচয় থাকিলেও তাহার নামের সহিত আমার পরিচয় কখনও হয় নাই। আমি পিনাকবাবুকে পূর্ব্বে ও বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াও proposal দিয়াছিলাম, চলুন গোপালবাবাজীর গুরুদেবের বাড়ীতে উঠি। পিনাকবাবু সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আমরা অগত্যা সাহজীর মন্দিরের নিকট পোদ্দারদের ঠাকুরবাড়ী গিয়া উঠিলাম। সে বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে আমি ২ বার উঠিয়াছিলাম। আহার ও বিশ্রামান্তে দেবকী নন্দন গোস্বামীর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। তাহার সঙ্গে দেখা হইল না। জানিনা কেন তিনি avoid করিলেন, তবে শুনিয়াছি তিনি বেশ উঁচু স্তরের সাধক, লীলা দর্শনাদি হয় (নতুবা মা-ই বা সেখানে পাঠাবেন কেন?)। দেবকীনন্দন গোস্বামী মহাশয়ের এক ছেলে দীক্ষা প্রার্থী জানিয়া দ্রব্যসামগ্রীর একখানি দীর্ঘ ফর্দ্দ তৈরী করিয়া দিলেন। পিনাকবাবুর মনঃপূত না হওয়ায় "বিবেচনা করিয়া দেখি" বলিয়া বিদায় নিলেন। আমরা তিনজন মিলিয়া বনমালী দাস গোস্বামীর বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া বনমালী দাস গোস্বামীর খোঁজাখুঁজি করিতেছিলাম (তটস্থা শক্তির স্বাভাবিক প্রকৃতি)। এমন সময় আমার একটি মারহাটী বন্ধু তুকারাম ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া তাহাকে বনমালী দাস গোস্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "এই যে তাঁর বাড়ী, বাহিরের ঘরে বসিয়া তিনি পাঠ করিতেছেন, ভিতরে গেলেই দেখিতে পাইবেন।" ভিতরে গিয়া দেখি ইনিই সেই গোপালবাবাজীর গুরুদেব। মনে মনে হাসিলাম—পিনাকবাবুর একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করিলেও তাহার টিকিটি যে এখানে বাঁধা; যাবেন কোথায়? পাঠ শেষ হইল, শ্রোতারা বিদায় নিলেন। পিনাকবাবু বলিলেন, "আমি মা আনন্দময়ী কর্তৃক অদিষ্ট হইয়া আপনার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।"

গোঃ—মা আনন্দময়ী কে? তাহাকে আমি কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।

পিনাকবাবু তখন তাহার বৃন্দাবন আসার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন তাহার ভাবী গুরুদেবের নিকট।

স্থিরচিত্তে সকল শুনিয়া বনমালী দাস গোস্বামী মহাশয় পিনাক-বাবুকে আশ্বাস দিলেন—আপনারা উভয়ে এখানে দীক্ষা পাইবেন।

পিঃ—দীক্ষার জন্য কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন?

গোঃ—রাধারমণের জন্য ফুল মালা ও আপনার অভিরুচি মত সামান্য ফল। রাধারমণকে বাহিরের মিষ্টি দেওয়া হয় না; পাঁচ আনার পয়সা রাখিয়া যান—একখানি ক্ষীর ভাণ্ড নেওয়া যাইবে—যাহারা ঠাকুর বাড়ীর মিষ্টি জোগান দেয় তাহাদের নিকট হইতে। প্রাতে ৮টার ভিতর যমুনায় স্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্রে, অভুক্ত অবস্থায় এখানে চলিয়া আসিবেন।

পরের দিন যথা সময়ে উভয়ে দীক্ষা পাইলেন। মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলে লক্ষ্য করিলাম তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে এক নতুন জীবনের ছাপ পড়িয়াছে। মালা ও তিলক ফোঁটায় মানুষকে এত সুন্দর দেখায় ইহা আমি কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। আমি নির্লজ্জের মত বারবার পিনাকবাবু ও তাহার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলাম। পিনাকবাবু হাসিখুসিতে ভরা, আমাকে বলিলেন, বহু দিন পূর্ব্বে গোপালবাবাজী রাধারমণের এক গাছি প্রসাদী মালা নিয়া আমায় পরাইয়া দিয়াছিলেন ” তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি উহার উপসংহার টানিয়া দিলাম, “আপনি তাহলে রাধারমণের বাগ্‌দত্তা কন্যা, মায়ের কৃপায় আজ আনুষ্ঠানিক মালাবদল হইল মাত্র। এবার ভোজনের আয়োজন করুন আত্মীয়-কুটুম্বের নিমন্ত্রণ ভার আমি নিতে প্রস্তুত।”

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণানুজঃ।
পুরুষাণাং শতৈঃ সার্দ্ধং স্বাত্মানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ॥

নাঃ পঃ ২।২।১৬

মনুষ্য মন্ত্রগ্রহণমাত্র নারায়ণের অনুজতুল্য হইয়া (স্নেহ অর্জ্জন করিয়া) শত পুরুষের সহিত নিজ আত্মাকে উদ্ধার করে।

পিনাকবাবু তাহার বাকী জীবন "কিছু হ'ল না, কিছু হ'ল না", বলিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। সে কান্না হওয়ার কান্না, না না হওয়ার কান্না পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। পিনাকবাবুর মৃত্যুর এক কি দেড় ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি তাহার শয্যা পার্শ্বে ছিলাম। তখনও তিনি নিজে নিজে বলিতেছিলেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। তাহার দেহত্যাগের পর ঐ রাত্রেই পিনাকবাবুর স্ত্রী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন—পিনাকবাবুর দেহটি একটি শিশুর দেহের মত ছোট হইয়া গেল। মা আনন্দময়ী উহা একখানা কম্বলে জড়াইয়া নিয়া চলিয়া গেলেন।

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত গোবিন্দ চরণস্য কথং ভবেৎ॥

—o—

(২)

মায়ের দরজা অবারিত সে আশ্বাস পাইয়া ভক্তদের পদানুসরণ করিতে করিতে পঞ্চুদার বাড়ী মায়ের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম কিন্তু অল্প সময়ের ভিতরই উপলব্ধি জন্মিল দরজা অবারিত হইলেও সময় বারিত। বহু দিনের বাঞ্ছিত ধন যখন স্বেচ্ছায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন আমি তাহার পদতলে বসিয়া রাত্রি যাপন করিব এই ছিল আমার অন্তরের বাসনা! রাত তখন প্রায় ১০টা, দূরাগত ভক্তবৃন্দ একে একে বিদায় নিয়াছেন, দেখিলাম যাহাদের রাত্রিবাস ঐ তাঁবুতে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে তাহাদের তীর্থ যাত্রীদের ছোট বিছানার মত ছোট ছোট বিছানাগুলি একে একে সারি বাঁধিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে। আমি এখান হইতে

সেখানে বারংবার শরীর সঙ্কোচন ও অপসরণ করিয়াও শেষ রক্ষা করিতে পারিলাম না, কেননা গৃহস্বামী আসিয়া বলিলেন, "মা এখন ঘুমাবেন।"

আমি—মা ঘুমান, আমি তাঁহার পায়ের তলায় বসিয়া থাকি।

গৃঃ—তাহা কি করিয়া হয়। আপনি আজ বাড়ী যান, না হয় কাল প্রাতে আসিবেন।

আমি নিরুপায় মনে করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে রাগে ও ক্ষোভে বাহির হইয়া আসিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, "আমি আর এ বাড়ীতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করিব না, যদি আমার কিছু গুরুবল থাকে মাকেই আমার ভবনে যাইতে হইবে।" রাস্তায় বাহির হইয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইতে বীরেন ভাই পিছন হইতে ডাকিতে লাগিল, "মশাই শুনুন, শুনুন।" মশাইর তখন শুনিবার মত অবস্থা ছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য।

বীরেন ভাই দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন, "মা আপনাকে ডাকিয়াছেন।" ঐ একটি কথা আমার মনের সকল গ্লানি দিল মুছাইয়া। ফিরিয়া গিয়া মায়ের কাছে বসিয়া আমি শান্ত ও সুস্থ বোধ করিলাম। কিছু সময় পরে সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে মনে হইল অধিক রাত বসিয়া থাকিয়া মায়ের না হ'ক অন্যান্যের নিদ্রার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নয়। রাত তখন অনেক, মাকে প্রণাম করিয়া ঘরমুখী হইলাম। সে পরশমণির একটি বারের পরশে আমি যে সোনা বা রূপা হইয়া গিয়াছিলাম তাহা নহে, তবে তেমন কিছু হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয় এ ধারণা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। মা সে বারের মত যে কয়টি দিন দিল্লীতে ছিলেন, আমি সে কয়টি দিন ঘর-বাড়ী, office এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ছোট তাঁবুর ভিতর মেয়েরা মাকে ঘিরিয়া থাকিলেও আমি অসঙ্কোচে তাহাদের ভিতর একটু জায়গা করিয়া বসিয়া পড়িতাম, ভুলিয়া যাইতাম সকল ব্যবধানের কথা, ঔচিত্য ও অনৌচিত্য। গুরুদত্ত নাম বিনা চেষ্টায় আমার ভিতর চলিতে থাকিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মা দিল্লী

হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও সে জের সামলাইতে ছুই চার দিন সময় লাগিয়াছিল আমার। আমার একটি office colleague আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বার বার মায়ের কাছে গিয়া সেখানে কি পান ?" আমি উত্তর দিয়াছিলাম, "আমি যাহা পাই তাহা অবশ্য আপনাকে দেখাইতে পারিব না, কিন্তু বাজারের অন্যান্য সামগ্রীর মত ওজন করা যায়, হৃদয়-নিক্তির সাহায্যে। পাওয়ার আনন্দে সকল ইন্দ্রিয় হয় পরিতৃপ্ত, ভুলিয়া যায় আর কিছু চাওয়া বা পাওয়ার সামগ্রী আছে কিনা !"

পঞ্চুদার বাড়ীর আর একটি ঘটনা—

পঞ্চুদার বাড়ীটি আমার বাড়ীর অতি নিকটে ছিল, সুতরাং সেখানে আমার যাতায়াত ছিল, কম হইলেও দিনে ছুই তিনবার। সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমা—বহু কারণে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। এই পূর্ণিমার ৬০।৬১ বৎসর পূর্ব্বের দোল পূর্ণিমার দিন আমার গুরুদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "নাম মানুষকে পাগল করে, তুমি এই পাগলকরা নাম নিবে কি ?" আমি সেই স্মৃতি বুকে করিয়া মায়ের নিকট গিয়া বলিলাম, "মা ইচ্ছা হয় ঠাকুরকে রং দিয়া লালে লাল করি, কিন্তু আমার সে শক্তি কোথায় ? তুমি ঠাকুরকে রং পরাইয়া দাও আমি উহা দেখিয়া চোখ জুড়াই।" মা বলিলেন, "ঠাকুরকে ত চোখের জলে লাল করিতে হয়······আমি ত বাবা কিছু বলিতে কইতে পারি না—কাল প্রাতে এখানে একটি মেয়ে আসবে, সে তোমাকে ঠাকুরের কথা শুনাবে।" মায়ের আদেশমত পর দিন যথা সময় গিয়া দেখি মায়ের কাছে একটি মেয়ে (Viceroy's press-এর হরিপদ বাবুর মেয়ে নাম বোধ হয় বীণা) একটি harmonium নিয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমি যাওয়া মাত্র গান ধরিল—

কানু সে বিনোদ রায়
তার বিনোদ চূড়াতে বিনোদ বরিহা
উড়িছে বিনোদ রায়, ইত্যাদি।

গানটি আমার নিকট হইয়াছিল মূর্ত ও জীবন্ত। মনে হইয়াছিল ভূরিদা ভূরিদা, মা তুমি আমায় কাণায় কাণায় ভরিয়া দিয়াছ—যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া। মাকে প্রণাম করিয়া যখন উঠিয়া আসিতেছিলাম মা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! (ঠাকুর) এসেছিলেন ত?" আমিও ঘাড় নাড়াইয়া জানাইয়াছিলাম—"হ্যাঁ।" মায়ের কথা ও আমার ঘাড় নাড়াইবার অর্থ কেহই বুঝিলেন না—জানিলেন না, দাতার দান কত বড়, কত সঙ্গোপনে।

এই তীর্থের পরবর্ত্তী ঘটনা—

ঐ উৎসব উপলক্ষে পঞ্চুদার বাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে দুইটি সামিয়ানা টাঙ্গানো হইয়াছিল। ভিতরের সামিয়ানাতে মা মেয়েদের নিয়া রং খেলিতেছিলেন, বাহিরে আমরা চারটি প্রাণী (আমি, পঙ্কজবাবু, হরিদাসবাবু Imperial records-র ও অন্য কে একজন ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না) ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলাম। মা হঠাৎ ঠিক নাচিতে নাচিতে ভিতরের সামিয়ানা হইতে আমাদের সামিয়ানার নীচে আসিয়া একে একে সকলকে এক একবার বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার তেমন গতিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন—মাতৃহৃদয়ের স্নেহস্পর্শে দিয়া গেলেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, নিয়া গেলেন এ ধূলি ধূসরিত পঙ্কিল হৃদয়ের পুঞ্জীভূত মালিন্য। মা নামের যদি কোন বিশেষণ থাকে তাহাও মা; অন্য বিশেষণে আমার তেমন প্রীতি নাই।

ঐ দিনের রাতের অন্য একটি চিত্র—

বুভুক্ষু ভোজের সন্ধান পাইলে, সে ভোজের বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়া বাহির যাইতে চায় না, কর্ম্মকর্ত্তাদের অনাদর উপেক্ষা সত্ত্বেও। সন্ধ্যার পর আবার পঞ্চুদার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। শুনিয়াছিলাম রাতের বেলায় সেখানে কীর্ত্তন হইবে এবং কীর্ত্তন হ'ক বা না হ'ক, কিছু না কিছু প্রাপ্য হইবে এই ছিল আশা। কীর্ত্তনের আসরে তখন অবশ্য লোকজন ছিল অনেক; কিন্তু মায়ের অনুপস্থিতিতে

কিছুই উপভোগ্য হইল না—বাড়ী চলিয়া আসিলাম রিক্ত হস্তে। বাড়ীতে আসিয়া আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সাথে সাথে শুনিতে পাইলাম যেন পঞ্চুদার বাড়ী হইতে কীর্ত্তনের সুর ভাসিয়া আসিতেছে, বুক জুড়ানো পাগলকরা সে নাম। মনে করিলাম মা বহিরঙ্গ লোকদের বিদায় দিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ এখন কীর্ত্তন করিতেছেন। কীর্ত্তনের সুর এক একবার সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, আবার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কোথায় যেন মিলাইয়া যায়। সে সুরের আসা ও যাওয়া উভয় মিলিয়া আমাকে অধীর করিয়া তুলিল। ঘরে না থাকিতে পারিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, ইতঃস্ততঃ করিতে লাগিলাম, কি করি। এদিকে আমার দরজা খোলার শব্দ পাইয়া আমার দাদা (স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ ঘোষ) বাহিরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও?" আমি বিনা উত্তরে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম, পরের দিন খোঁজ নিয়া জানিলাম সে সময় পঞ্চুদার বাড়ী কোনই অনুষ্ঠান ছিল না। অজানা জিনিষ অজানাই রহিয়া গেল।

সে সৌভাগ্য যে মায়ের স্নেহ আলিঙ্গনের ফল সে কথা জানিয়াই আজ সকলকে উহা বলিতে সাহস পাইতেছি।

স্থান পাঁচকুইয়া রোডের আশ্রম—

আশ্রমটি ছিল শশ্মানের দিকে কতকটা পাথরে ভর্ত্তি জঙ্গলের ভিতর, একটা উগ্র বৈরাগ্যের আঁচ লাগিয়াছিল উহার অঙ্গে অঙ্গে। মা দিল্লী আসিলে এখন এই আশ্রমেই থাকেন। এ আশ্রমে সাধন মহারাজ সাপের সঙ্গে ঘর করিয়াছেন, উপেনবাবু (মির্জ্জাপুরের ডাক্তার) ঘরে কখনও তালা লাগান নাই। একদিন তালা লাগাইয়া চাবি হারাইয়া বেয়াকুব হওয়ার পর সত্য সত্য কান ধরিয়া নাকে খত দিয়া তবে চাবিটি তাহার পায়ের কাছেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, বালক বিশু নির্জন প্রান্তরে মায়ের নাম গাহিয়া রাত কাটাইয়াছে,

ধীরেন দা (৺জিতেনবাবুর দাদা) একক বহুদিন এই আশ্রম আগলাইয়া ছিলেন। সকলের বল ভরসা ছিল মায়ের একখানি পটমূর্ত্তি, দিল্লীর আদি বিগ্রহ। এ আশ্রমে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল।

মা দিল্লী আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই আশ্রমে উপস্থিত হওয়া ছিল আমার নিয়ম বা ব্রত। একদিন আমার দুর্ব্বলতাবশতঃ সে ব্রত ভঙ্গ হইয়া গেল। মা আসিয়াছিলেন রাতে, আমি পৌঁছিলাম পরের দিন প্রাতে। মাকে যেমন প্রণাম করিয়া উঠিলাম মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

আমি—ভাল আছি।

মা বলিলেন শরীর ভাল থাকিলেই ভাল বলা চলে না।

মায়ের ঐরূপ বলার কারণ আমি অজ্ঞাত ছিলাম না। যে পবিত্রতা নিয়া মায়ের নিকট যাওয়া উচিত সে পবিত্রতা সে দিন ছিল না আমার দেহ ও মনে।

অন্য একদিন আশ্রমে যাইতে ঐরূপ এক কি দেড় ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। অবশ্য কারণটি ছিল অন্যরূপ। পিনাকবাবুর বড় ছেলে লক্ষ্মী বার্ষিক পরীক্ষায় fail করিয়া তিন-চার দিন ধরিয়া দিল্লীর পার্কে পার্কে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিল। তাহার খোঁজ করিতে যাইয়াই যথাসময়ে আশ্রমে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। ঐ দিন যাইয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন; "তোমরা আমার আসার সংবাদ এখন পেলে?" সে ছোট কথাটিতে মিসান ছিল কত আদর ও আবদার। জানিনা আমি ছাড়া মায়ের এমন আদর ক'জন পাইয়াছেন।

সন্দেহ নিরসন—

একটু বেলা হইতে আশ্রমে গিয়া দেখি মা ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া বসার ঘরখানায় (passage room-এর পরের ঘরটা) একটি দেয়াল ঘেসিয়া বসিয়া আছেন; সামনে উপবিষ্ট স্বনামধন্য

Dr. J. K. Sen (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রশিষ্য) তাহার এক পুত্র K. K. Sen (Acctt. Genl. Central Revenue) ও K. K. Sen (Delhi University–র registrar)। মা অনেক সময় ধরিয়া তাহাদের সাথে কথা বলিতেছেন। আমার বসিয়া বসিয়া বিরক্তি ধরিল, বিশেষ কারণ তাহাদের প্রশ্নগুলি আমার মনের মত ছিল না, মায়ের উপর সন্দেহ জাগিল; মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম একটা বাজে লোকের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি না ত' ? যেমন ঐরূপ ভাবা তেমন আমার মনে হইল মা যেন তাহার একখানা হাত বাড়াইয়া পাঁচ-সাত হাত দূর হইতে আমার মাথার চুলের মুটকি ধরিয়া সজোরে তাহার দিকে টানিতেছেন। ইহা আমার কল্পনা নয় প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আমিও আমার সকল সামর্থ্য দিয়া মাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার কেরোসিনের ডিবা-বাতির ক্ষীণ আলোক প্রভাকরের দীপ্ত আলোর ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। আমি হারিয়া গিয়া জয়ের আনন্দে অধীর হইলাম।

মায়ের আকর্ষণ—

মা দিল্লী আসিয়াছেন, বেশ আশ্রমে যাই আসি। একদিন রাতে বাসায় ফিরিবার সময় আমার পরম হিতৈষী বান্ধব স্বর্গীয় জিতেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, "শিবেনবাবু, কাল খুব সকালে আসিবেন মাকে একটু কীর্ত্তন শোনান যাবে।"

সূর্য্যোদয়ের একটু পূর্ব্বেই আশ্রমে গিয়া দেখিলাম সকল নীরব। কেবল মায়ের শোয়ার ঘরের দরজাটি (বাহিরের দিকের) একটু সামান্য খোলা আছে। আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়া মায়ের নিকট বসিলাম। মা তখন জাগিয়া, কিন্তু শায়িত। খুকুনী দিদি ঘরে ছিলেন বাহিরে চলিয়া গেলেন। মাও নীরব আমিও নীরব। প্রায় আধ ঘণ্টার পর মায়ের আদেশে ঘরের দরজা খুলিয়া দিলাম। সূর্য্য রশ্মির সাথে সাথে অপেক্ষমান ভক্তবৃন্দ ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন, আমি

স্বেচ্ছায় displaced হইলাম। বাহিরে আসিয়া জানিতে পারিলাম, আমার এরূপ বসিয়া থাকার জন্য পঙ্কুদা আমার সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন যথা "মায়ের শরীর খারাপ, মটর নিয়া আসিয়াছিলাম মাকে নিয়া একটু বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া, কিন্তু এরূপ লোক আসিয়া সময় অসময় বসিয়া private করিলে (private কথাবার্ত্তা বলিলে) মা বাহির হইবেন কি করিয়া।" কীর্ত্তনের সময় কখন কখন বেসামাল হইয়া পড়া আমার একটা chronic disease। ইতিপূর্ব্বেই সে বিষয়ও পঙ্কুদা আমাকে সাক্ষাৎ ভাবেই কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। দুইটি কারণ মিলিয়া মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল যদিও জানিতাম মা স্বতন্ত্র; আমার বসিয়া থাকা বা না থাকা কোনটার উপরই তাহার কোথাও যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করে না। নানা কথা ভাবিয়া মনে করিলাম আশ্রম কর্তৃপক্ষ আমার জন্য আশ্রমের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। সেদিন ও পরের দিন সেদিকে আর পা বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না। মায়ের টান বড় টান, তৃতীয় দিনে আশ্রম compound-এর বাহিরে দাঁড়াইয়া মাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলাম।

চতুর্থ দিনও আশ্রমের বাহিরে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব বুকে নিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। এমন সময় অভয়দা ভিতর হইতে বলিতে বলিতে বাহির হইলেন, "মা বলছেন—আমার এক বাবাকে তোমরা কে কি বলেছ—বাবা আর আশ্রমে আসিতেছে না। সে কে?" আমার সকল আনন্দের অংশীদার পিনাকবাবু আমার কাছেই দাঁড়ান ছিলেন। তিনি আমাকে দেখাইয়া দিলেন। তখন পঙ্কজবাবু আমাকে যে ভাবে আশ্রমে মায়ের নিকট নিয়া গেলেন তাহা শুধু বৈষ্ণব দীনতা নয় ধর্ম্মজীবনের এক উচ্চ আদর্শও বটে। ভিতরে গিয়া মায়ের অতি নিকটে বসিলাম। খুকুনী দিদি মাকে বলিলেন, "শিবেনবাবু কয়েকদিন ধরিয়াই আশ্রমে আসিতেছেন না।"

মা—না, ও কালও আসিয়াছিল এবং বাহিরে অমুক জায়গায় দাঁড়ান ছিল। (মায়ের দৃষ্টি ইট পাথর বা হাড় মাংসে ব্যাহত হয় না।) মা আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তুই আমার নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিস?"

আমি—খুব পারি।

মা—না, মোটেই না। তুই যেখানে থাকিস না কেন আমার একটা চোখ তোর উপর সর্ব্বদা আছে জানবি।

দরদী মায়ের কথা শুনিয়া আমি আর আত্ম সংবরণ করিতে পারিলাম না, মায়ের কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলাম। সে কাঁদায় যে কত আনন্দ ভাবিয়া আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

মায়ের কৃপা আমার নিকট যখনই আসিয়াছে, আসিয়াছে lottery-র টিকিটের টাকার মত। আমার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বিবেচনা না করিয়া এবং এই lottery-র টিকিট একাধিকবার পঞ্চুদাই কিনিয়া দিয়াছেন। তাই তাহাকে বার বার জানাই আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

বাবর রোড আশ্রম তীর্থ—

এই জায়গাটাও পাঁচকুইয়া রোডের মত অনেকটা জনবিরল, সাধন-ভজনের প্রতিকূল নহে। একেবারে নূতন বাড়ী। কোন গৃহমেধী কর্ত্তৃক বাস-দুষ্ট নয়। মায়ের সাময়িক আশ্রমের জন্যই ভাড়া নেওয়া হইয়াছিল। যে ঘটনার কথা বলিতে যাইতেছি তাহাও ঘটিয়াছিল এক দোল পূর্ণিমার দিন। সুতরাং মনটা ছিল আমার সে দিন লাল। কত উৎসাহের সহিত আবির নিয়া গিয়াছি মায়ের দুইটি পায়ে পরাইয়া দিব। আশ্রমে গিয়া মাকে প্রণাম করিতেই, মা পা দুইখানি গুটাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া দিলেন। আমি আবির হাতে করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অভয়দা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তিনি আসিলেন আমার সাহায্যার্থে,

নিজের হাতে মায়ের পা দুইখানি হইতে বস্ত্রাঞ্চল অপসারণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। আমি নিজেকে নিজে বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী মনে করিয়া বসিয়া রহিলাম। নয়টা কি দশটার সময় মা ও আশ্রমবাসী অন্যান্য ভক্ত (বাড়ী আগলাইবার জন্য দুই একজন বাদ দিয়া) সকলে চলিয়া গেলেন Dr. J. K. Sen মহাশয়ের বাড়ী। সেখানে সেদিন মায়ের ভোগের ব্যবস্থা। সেই নির্জন পুরীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, "যাই কোথায় ; এ চরণে আমার ঠাঁই না হইলে আমাকে ঠাঁই দিবার মত দুনিয়ায় আর কে আছে ?" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘণ্টা তিন বা তার কিছু বেশী কাটিয়া গেল। প্রায় একটা তখন বাজে, ডাক্তারবাবুর গাড়ী মা ও খুকুনী দিদিকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মা আমাকে ঐ একই জায়গায় প্রতীক্ষমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই সেই সময় হইতে নাকে হাত দিয়া এখানে বসিয়া আছিস ? কেন ?"

উত্তর—তুমি আমাকে তোমার পায়ে আবির দিতে দিলে না কেন ? মা আর কিছু না বলিয়া হাসিতে হাসিতে শোয়ার ঘরে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই সেখান হইতে খুকুনী দিদি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিবেনবাবু ভিতরে আসুন, মা ডাকছেন।" ভিতরে গিয়া দেখি মা অর্দ্ধশায়িত। বিছানার উপর আর একখানি চাদর বিছান হইয়াছে, তাহার উপর মা তাহার পা দুইখানি ছড়াইয়া দিয়াছেন। খুকুনী দিদি তাহার ভাণ্ডার হইতে আবির দিয়া বলিলেন, "আপনি এখন আবির দিন।" নিধুবনে একা পাইয়া আমি আমার ইচ্ছামত আবির দিলাম। এ সৌভাগ্য আমার সহজ ভাবে লাভ হইলে এত আনন্দ নিশ্চয়ই হইত না এবং যিনি কাঁদাইয়া কাঁদিতে ভালবাসেন তাহারও আনন্দ পূর্ণাঙ্গ হইত কিনা সন্দেহ। খুকুনী দিদি তখন বলিলেন, "শিবেনবাবু সারাদিন কিছু খায় নাই, কিছু ফল কাটিয়া দেই।" মা বলিলেন, "থাক, সারাদিন যখন খায় নাই তখন এখন আর নাই খাইল।" বুঝিলাম, আমরা যে

পথে চলিতে চাই সে পথে মাঝে মাঝে অন্ততঃ বিশেষ বিশেষ দিনে লঙ্ঘন অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

হনুমান রোড তীর্থ—

J. K. Sen মহাশয় মহাভাগ্যবান পুরুষ। তাহার বাড়ীতে কীর্ত্তন মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে এবং এরূপ উৎসব তাহার বাড়ীতে প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। মা দেরাদুন হইতে দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন কীর্ত্তনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে। মায়ের আগমনের সাথে সাথে ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল। তারপর সুসজ্জিত কীর্ত্তন মণ্ডপের মঞ্চ ঘিরিয়া যখন খোল করতাল সংযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন ধরার বুকের সে আনন্দতরঙ্গ গিয়া পৌঁছিল আকাশে বাতাসে। কীর্ত্তনের প্রারম্ভে মা ছিলেন বসা, তখনই খেয়াল করিয়াছিলাম মায়ের আননে ক্রমেই স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। একটু পরেই মা দাঁড়াইয়া কীর্ত্তনীয়াদের সাথে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, দুই হাত তুলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে; তাঁহার দ্রুত গতি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। অবশেষে মা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; শরীরটি দুলিতে লাগিল দক্ষিণ ও বামে। হঠাৎ পড়িয়া গিয়া ঝড়ের শুকনা পাতার মত মা কীর্ত্তন মণ্ডপের এদিক হইতে সেদিক গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থা একটু প্রশমিত হইলে কয়েকজন ভক্ত মাকে ধরাধরি করিয়া নিয়া তাঁবুর ভিতর বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন সম্পূর্ণ সম্বিৎহারা। কীর্ত্তনান্তে যখন বাসায় ফিরিলাম দেখিলাম, মায়ের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অতি প্রত্যূষে গিয়া দেখিলাম; খুকুনী দিদি মায়ের মুখ ধোয়াইয়া দিতেছেন। শুনিলাম অল্প কিছু আগে মায়ের সমাধি ভাঙ্গিয়াছে। খুকুনী দিদি কার্য্যান্তরে বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন মায়ের পদপ্রান্তে বসা আমি ও মনোজদা। মা তখনও স্বাভাবিক ভাবে কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। শিশুর মত জড়ান ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, "দেরাদুন

হইতে আসার পথে (ট্রেনের ভিতর বসিয়াই) এক নামের মণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনই শরীরটা কেমন যেন আউলাইয়া গিয়াছিল, কোন রকমে সামলান গিয়াছিল। কাল কীর্ত্তন মণ্ডপে যখন আবার সে নামের মণ্ডলী উপস্থিত হইলেন, তখন তোমাদের এই পাগল মেয়েটার মাথা আর কিছুতেই ঠিক রহিল না।” মায়ের কৃপায় জীবনে এই প্রথম নামের মণ্ডলীর কথা শুনিলাম। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহার নিকট এই নামের মণ্ডলী বা ঝাকের কথা শুনিয়াছিলাম তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য রাধাকুণ্ডের ধূনী আশ্রমের নামের সাধক ৺দ্বারকনাথ রায়। বাংলায় হরেকৃষ্ণ পট বিগ্রহের প্রথম পূজারী কালনার ভগবানদাস বাবাজী; দ্বিতীয় নাম ব্রহ্মের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা গোস্বামী প্রভু। “মহাপাতকীর জীবনে সৎগুরুর লীলা” এই গ্রন্থখানিতে দেখিয়াছি লেখক হরিদাস বসু মহাশয় এই নামের সহিত আবদার, আদোর, মান-অভিমান কতই কিছু করিতেন। শ্রীরূপ গোস্বামী এই নামের কথা লিখিয়াছেন।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম। এই নাম করার জন্য বহু জিহ্বার বাঞ্ছা জাগে, বহু কর্ণে শুনিয়াও সাধ মেটে না।

মায়ের শাসন বনাম শিক্ষা—

মা কথা বলুন আর নাই বলুন, প্রণাম করিলে উহা স্মিত আননে গ্রহণ করেন, এই দেখিয়াছি মায়ের সাধারণ নিয়ম; অন্ততঃ আমার বেলায়। মা ডাক্তারবাবুর বাগানের কাঠের ঘরখানিতে বসিয়া ছিলেন। ঘরের ভিতরে ও বাহিরে মেয়ে পুরুষ বহুলোক মায়ের অমৃতময়ী বাণী শুনিতেছিলেন। আমি সামনে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম, এক বৈষয়িক সমস্যার সমাধানের প্রার্থনা অন্তরে নিয়া। মা আমার দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। আমিও বুঝিয়া নিলাম এরূপ প্রণাম মায়ের একেবারেই অভিপ্রেত নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কীর্ত্তনাদির সময় আমার বেসামাল হইয়া পড়ার একটা রোগ আছে। মায়ের নিকট গেলে এই রোগটার প্রকোপ সাধারণতঃ একটু বৃদ্ধি পায়। এজন্য আমি মাকেই দায়ী করিতে বাধ্য। মা হাওয়া দ্বারা আগুন নিভান বা প্রজ্জ্বলিত করেন বুঝা শক্ত। এই আশ্রমে বসিয়া মা আমাকে একদিন সর্ব্বসমক্ষে ধমক দিয়া বলিলেন, "খাবি ত' ওগরাবি কেন ?" শাস্ত্রের বাক্য অনেক সময় বোধগম্য হইয়া উঠে না, কিন্তু মায়ের স্বল্প ও সোজা কথা চেষ্টা করিয়া বুঝিতে হয় না, উহা আপন গুণে অন্তরস্পর্শী, সহজবেদ্য।

মা দেরাদুন হইতে কাশী যাইতেছেন দিল্লীর পথে। সংবাদ পাইয়া কয়েকজন ভক্ত দিল্লী station-এ গিয়াছেন, আমিও তাহাদের অনুগমন করিলাম। দিল্লীর ভক্তগণ মাকে সেদিন দিল্লী থাকিয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মা সম্মত হইলেন না। আমারও বিশেষ আগ্রহ, মা অন্ততঃ ঐদিন দিল্লী থাকিয়া ভক্তদের আগ্রহ পূর্ণ করেন। আমি মাকে কাতর প্রাণে নিবেদন করিলাম, "মা তুমি দিল্লী এলে অথচ কাহাকেও একটু ভাল করিয়া দেখার সুযোগ দিলে না। আজকের দিনটি তুমি থাকিয়া যাও।" আমার কাতর প্রার্থনায় মা ঐদিন দিল্লী থাকিতে সম্মত হইয়া ঠিক যখন সম্মতি জ্ঞাপক বাক্যটি উচ্চারণ করিতে যাইতেছিলেন, তখন স্বর্গীয় অমল সেন মহাশয় (Hindustan Insurance Co.-র Delhi Branch-এর Manager) বলিয়া ফেলিলেন, "মা এবার শক্তের পাল্লায় পড়িয়াছেন।" ঐ কথাটিতে আমি যেমন একটু গর্ব্ব বোধ করিলাম, অমনি মায়ের মনের হ্যাঁ শব্দটি মুখে না হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা পদ্ধতি কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ছোটবেলা হইতে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পাঠ করিয়া মুনিঋষিদের যে আশ্রম মনের ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছিল সে সকল

আশ্রম আজ রাজপুরীতে পরিণত হইয়াছে। আগরপাড়া আশ্রমে মাকে প্রণাম করিতে গিয়া মায়ের কাছাকাছি কোন রকমেই পৌঁছাইতে পারিলাম না। নাট মন্দিরে সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মনে মনে নাম করিতেছি ও এ ফাঁক ও ফাঁকের ভিতর দিয়া মাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, মা ডান হাতে দুইটি আঙ্গুল বাঁকাইয়া আমাকে একটা ইঙ্গিত করিলেন। মায়ের ডানদিকে বসা ছিল গিনি (আশৈশব মায়ের ভক্ত ও সঙ্গী, অমলবাবুর মেয়ে)। গিনি এদিক সেদিক তাকাইয়া মায়ের ইঙ্গিত কাহার জন্য খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু মায়ের দান সকল ধরা ছোঁওয়ার বাহিরে।

অন্য একদিন সংযম-সপ্তাহের সময় একবার কাছে গিয়া মাকে একটি প্রণাম করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। মা ছিলেন গঙ্গার ঘাটের উপরের ছোট খড়ের ঘরখানিতে। আমার শক্তিসামর্থ্যে সেখানে পৌঁছান গেল না। দিল্লীর ননী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমার জন্য একটু চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল না। মনে বেদনা নিয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। এই ঘটনাটির দুই একদিন পরেই মা যোধপুর পার্কে (দক্ষিণ কলিকাতা) শ্রীযুত অমল সেন (Retired Controller of Stationery & Printing C. Govt.) মহাশয়ের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে তাহার বাড়ীতে আসেন। আমি ঐ বাড়ীর কিয়দ্দূরে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম, মা মোটরে ভিতরে না গিয়া রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলেন, আমি প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "তোমাকে সেদিন আগরপাড়ায় দেখিয়াছিলাম না?"

—o—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।

ভাঃ ১০।৩১।৯

তোমার কথামৃত বিবিধ তাপদগ্ধ জনের জীবনপ্রদ, বিজ্ঞজন সংস্তুত, সর্ব্বদুঃখহা, শ্রবণ মঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বদা পরিগীত। অতএব যে ব্যাক্তি তোমার কথা কীর্ত্তন করেন তিনি মহাদাতা।

কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে ভিখারী। তবে সান্ত্বনার বিষয় মুষ্টি ভিক্ষার অন্ন অতি পবিত্র। উহা দ্বারা ভগবৎ সেবা ও অতিথি সৎকার উভয় কাজই চলিতে পারে। সেই ভরসা লইয়াই এই প্রবন্ধটি লিখিতে অগ্রসর হইলাম। অতিথি পরিতুষ্ট হইলেই ভিক্ষা আমার সফল।

দীর্ঘকাল বাংলার বাহিরে থাকার ফলে পরবাসী বাঙালীদের সাথে মেলামেশার একটা না একটা যোগসূত্র যে কোন প্রকারে মিলিয়া যাইত। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, সে বন্ধুত্ব ছিল একটু অন্য ধরণের। যখন New Delhi-তে আমাদের Office ছিল, তখন আমার বাড়ী হইতে Office-এর দূরত্ব ছিল তিন মাইলের বেশী এবং যখন Timarpur-এ Office করিতে হইত তখন দূরত্ব ছিল পাঁচ মাইলের একটু বেশী। অতুলবাবুর মুখে ভগবদ্ প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে প্রত্যহ এই দীর্ঘ পথ প্রায় হাঁটিয়া আসা যাওয়া করিতাম। কিন্তু কখনও পথশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম না—কেবল অতুলবাবুর সঙ্গগুণে। গীতা, চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবত এ তিনখানি পুস্তক ছিল তাহার কণ্ঠস্থ। ভাগবত হইতেও অংশ বিশেষে নির্ভুল quotation দিতে পারিতেন। অতুলবাবুর বাড়ী ছিল বৈদ্যবাটীর নিকটবর্ত্তী শেওড়াফুলি গ্রামে।

তিনি বাড়ীর ভাত খাইয়া শ্রীরামপুর Christian Missionery College হইতে B.A. পাশ করেন। Missionery College-এর আবহাওয়ায় পড়িয়া তিনি এক নূতন মানুষ গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলনে দেখা দিয়াছিল আধুনিক যুগের এক পরিবর্ত্তন। ভগবান থাকিলেও তাহার জন্য মাথা ঘামান তিনি দরকার বোধ করিতেন না। ঠিক সেই সময় তিনি apendicitis রোগে আক্রান্ত হইয়া operation theatre-এ নীত হন। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় সজল নয়নে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে দয়াল ঠাকুর, আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া ভুলেও কখনও তোমার নাম করি নাই। এবারের মত আমাকে প্রাণভিক্ষা দাও; তোমাকে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া নিই।" আর্ত্তের ভগবান আর্ত্ত ভক্তের কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। অতুলবাবু একরকম যমের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভগবান বলিয়া একজন আছেন ও জীব তাহার নিত্যদাস সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন।

অতুলবাবুর রতিমতি ভগবানে ফিরিয়া আসিল বটে কিন্তু মনের মত গুরুদেব তিনি আর খুঁজিয়া পান না। খোঁজাখুজি করিয়াই বেশী না হ'ক বছর বিশেক কাটাইয়া দিলেন। সে বোধ হয় ১৯৪৬-৪৭ সনের কথা। মা আনন্দময়ী দিল্লী আসিয়া পাঁচকুইয়া রোড আশ্রমে আছেন। অতুলবাবু তিন-চার বছর ধরিয়া মায়ের নিকট আসেন যান কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি দীক্ষার কথা মাকে কখনও কিছু বলিতে পারেন নাই, আজও পারিলেন না। মনে মনে জানাইলেন, "মা, তুমি কত লোকের উপায় বাতলাইয়া দিলে, তোমার এ ছেলেটাকে একবার বলিয়া দাও না কেন, কোথায় তাহার মাথা বিকান আছে।" অতুলবাবু ঐ বলিয়া অন্যান্য দিনের মত মাকে প্রণাম করিয়া আশ্রমের বাহির হইতেই কতগুলি কাঠের উপর দেখিতে পাইলেন আলকাতরায় লেখা আছে, "দরবেশ, দরবেশ, দরবেশ।" জাগা ঘরে চুরি হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতুলবাবুর

বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না—এটি মায়ের ইঙ্গিত এবং দরবেশজীই তাহার ভাবী পরিত্রাতা। অতুলবাবু পূর্ব্বেই আমার নিকট দরবেশজীর দুই একটি কথা শুনিয়াছিলেন। অতুলবাবু ঐরূপ ইঙ্গিত পাওয়ার কয়েকদিন পরেই আমি আমার স্ত্রীকে নিয়া কাশী যাইতে-ছিলাম দরবেশজীর নিকট দীক্ষা নেওয়াইবার জন্য। সুযোগ বুঝিয়া অতুলবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আমাদের সঙ্গী হইলেন। অর্দ্ধ পথ গিয়া অতুলবাবুর মনে এক সন্দেহ জাগিল—দরবেশজী ব্রাহ্মণ কী অব্রাহ্মণ। আমাকে এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন। আমি উত্তর দিলাম, "দরবেশজীর পূর্ব্বাশ্রমের সংবাদ আমি রাখি না; তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য, সাধু ও সন্ন্যাসী। এক সময় নাম করিতে করিতে তাহার অঙ্গে নাম ফুটিয়া উঠিত—ইহার উপর তাঁহার অন্য কোন পরিচয় নেওয়া আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তিনি যদি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব না হ'ন ও আপনার অভিরুচি যদি না হয়; দীক্ষা নিবেন না। কিন্তু কাশী পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে, কেন না আপনার বা আমার প্রয়োজন বোধে train এখান হইতে দিল্লী ফিরিয়া যাইবে না।" অতুলবাবু কাশী পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠে গিয়া সংবাদ নিলেন দরবেশজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম কিরণচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, ফরিদপুর জিলার খালিয়া গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণ ও জমিদার বংশের ছেলে—অধুনা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। (সন্ন্যাসের নাম কৈশোরানন্দ সরস্বতী)। একদিন শত তালি যুক্ত একটি over-coat পরিহিত দেখিয়া তাহার গুরুদেব তাহাকে আদর করিয়া দরবেশ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। শ্রীগুরু-প্রদত্ত নামটি অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ তিনি উহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, ইত্যাদি। যাহা হ'ক ১৩৪৭ সনের রাম নবমীর দিন বিজয়কৃষ্ণ মঠের পাতাল ঘরখানিতে বসিয়া দীক্ষাপ্রার্থীত্রয় দীক্ষা পাইলেন। দীক্ষান্তে অতুলবাবু দরবেশজীর পদপ্রান্তে কয়েকটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। দরবেশজী উহাতে বিশেষ লজ্জিত হইয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, "সে

কি কথা, তুমি আজ আমাকে দান করিবে কি ! আমি আজ তোমার হৃদয়ে আমার গুরুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তুমি আমাকে সে মন্দির মার্জ্জনার অধিকার দিলেই আমি আমাকে ধন্য মনে করিব। আজ তুমি আমাকে এক ছিলিম তামাক সাজাইয়া দিলেও আমি উহা গ্রহণ করিতে পারিব না। তবে, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একটি কথা মনে রাখিও—প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া নাম ও প্রদর্শিত পথে প্রাণায়াম করিবে।" এই গুরুবাক্য অতুলবাবু আমরণ যথাযথ পালন করিয়াছেন। অন্য কোথাও গেলে নিয়ম লঙ্ঘন হয় সেই আশঙ্কায় তিনি দিল্লী ছাড়িয়া কখনও বাহিরে যাইতেন না। প্রাতে তিন ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা জপে, পাঠে ও প্রাণায়মে অতিবাহিত করিতেন। আমার সামনেই তাহার দুইটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল, তাহাদের বিবাহের দিনও অতুলবাবুর সে নিয়মের অন্যথা হয় নাই। দীর্ঘ আঠাশ বৎসর আমি অতুলবাবুর সঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু না ঘরে, না office-এ তাহাকে একদিনের জন্যও রাগিতে দেখিয়াছি। অতুলবাবুর স্ত্রী বলিতেন, "উনি রাগিবেন কি, গায়ে রক্ত থাকিলে ত' রাগিবেন, কেঁচোর শরীর। আমি রাগাইতে চেষ্টা করিয়া হার মানিয়া গিয়াছি।" Office-এর উর্দ্ধতন officer character roll-এ remark করিয়াছিলেন, He is too good। অতুলবাবুর সিমলা ও দিল্লীর অনেক বন্ধু ছিলেন। সকলের ভালবাসাও তিনি যথেষ্ট পাইতেন, কিন্তু বাজে কথার ভয়ে কাহারও সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়াইয়াও তিনি নমস্কার প্রতিনমস্কারের বেশী আলাপ করা পছন্দ করিতেন না।

মায়ের অনুগ্রহেই অতুলবাবুর দীক্ষা লাভ ও ধর্ম্মজীবনের পাকা ভিত স্থাপিত হয়। কিন্তু অতুলবাবুর দীক্ষার কথা আমি বা অতুলবাবু কেহই কখনও মাকে বলি নাই ও বলার দরকারও মনে করি নাই। অতুলবাবুর দীক্ষার প্রায় এক বছর প'রে মা দিল্লী আসেন। আমি ও অতুলবাবু উভয়ে মাকে দেখিতে যাই ডাক্তার J. K. Sen

মহাশয়ের বাড়ী। ভিড়ের ভিতর লোক ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে না পারিয়া অতুলবাবু দূর হইতে মাকে এক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিলেন। মা তৎক্ষণাৎ ঐ ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া যেন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন এমন ভাবে অতুলবাবুর মাথার উপর একখানি পা দিয়া বলিলেন, "কাশীতে দেখিয়া আসিলাম দরবেশবাবা বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এবার শরীর থাকে বলিয়া মনে হয় না—তুমি বাবার এ সংবাদ জান না?" এই কথা বলিয়া মা আবার ভিড়ের ভিতর মিলাইয়া গেলেন। মায়ের কার্য্যাবলী সাগরের জোয়ার-ভাঁটার মত—খাল-বিলের তীরবর্ত্তী লোকের সহজে অধিগম্য নহে।

পাঁচকুইয়া রোড আশ্রমের অন্য একটি ছোট ঘটনা স্বল্প হইলেও উপাদেয় হইবে আশাকরি—

মা দেরাছুন হইতে দিল্লী আসিয়াছেন। মাকে দেখিতে গিয়া আশ্রমে এক নূতন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়া গেল। শুনিলাম মা যে train-এ দিল্লী আসিয়াছেন ভদ্রলোকটিও সেই train-এ আসিয়াছেন মিরাট হইতে। মিরাটে আমার অনেকদিন হইতে যাওয়া-আসা ছিল এবং অনেক বাঙালীকেই চিনিতাম সুতরাং উক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে অল্পেই আলাপ জমিয়া উঠিল। সে দিন আশ্রমে প্রসাদের তেমন ঢালাও ব্যবস্থা ছিল না। আমি ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, "আপনারা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়া চলুন আমার বাসায়, স্নান আহার সারিয়া মায়ের নিকট গ্যাট হইয়া বসিবেন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন, দাদা, আমার পোঁটলা-পুঁটলি কিছুই নাই এবং পোঁটলা-পুঁটলি লওয়ারও সময় পাই নাই। শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই শুনিতে পাইলাম, মা যেন বলিতেছেন, "আমি দিল্লী যাইতেছি বাবা, তুমি সেখানে আমার সহিত দেখা করিবে না?" ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম train পৌঁছাইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। এদিকে স্ত্রী গিয়াছেন bathroom-এ। কাহাকেই বা বলি এবং কেই বা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া দেয়। বাহির হইতে স্ত্রীকে

ডাকিয়া বলিলাম, "আমি মা আনন্দময়ীকে দেখিতে দিল্লী চলিলাম, ফিরিতে রাত হইবে।" রাস্তায় তখনও রিক্সা চলাচল আরম্ভ হয় নাই, ছুটিতে ছুটিতে station-এ পৌছিয়া একখানি ticket কাটিয়া train-এ উঠিতেই train-টি ছাড়িয়া দিল। দাদা, মা ডাক দিলে কি আর পোঁটলা-পুঁটলির কথা মনে থাকে, না উহা বাঁধিবার সময় পাওয়া যায়।

সে বছর কুম্ভমেলায় আমার দাদা বৌদি হরিদ্বার যান। বৌদি গিরিমহারাজের ও দাদা স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিজীর চরণাশ্রিত। সুতরাং গিরিমহারাজের আশ্রমে তাঁহারা সহজেই আশ্রয় পাইয়া গেলেন। মাও তখন হরিদ্বার ছিলেন। মাকে দেখিতে গিয়া মায়ের তাঁবুতে এক মিষ্টভাষী অক্লান্ত কর্মীর সাথে দাদার আলাপ জমিয়া গেল। তাঁহার আদর যত্নে দাদা-বৌদি বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। হরিদ্বার হইতে ফিরিবার সময় দাদা-বৌদি উভয়ে তাঁহাকে আমাদের দিল্লীর বাসায় আসার জন্য বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। কুম্ভমেলার কয়েকমাস প'রে তিনি একদিন আমাদের দিল্লীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি সেই সুযোগে তাঁহাকে তাঁহার জীবনের এমন একটি ঘটনা বলিতে অনুরোধ করিলাম যে ঘটনাটিতে তিনি মায়ের অশেষ স্নেহের পরিচয় পাইয়াছেন ও যাহা তাঁহার জীবনে এক গভীর দাগ কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমাকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন উহাই এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

আমি মা মরা ছেলে, পিতৃস্নেহও তেমন পাই নাই। অতি দুঃখে বাড়ী হইতে পালাইয়া এবং কয়েকদিন পুলিশ হাজতে বাস করিয়া অবশেষে আসিয়া পৌছিলাম হরিদ্বার। এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করিয়া শুনিতে পাইলাম দেরাদুনে একজন সাধুমা আছেন, নাম মা আনন্দময়ী। তিনি প্রকৃত সাধু। তাপদগ্ধ জীবনে শান্তি দিবার ক্ষমতা তিনি রাখেন। ঘরছাড়া ছেলের দল তাহাকে মা ডাকিয়া মা

হারাণোর দুঃখ যায় ভুলিয়া। দেরাদুনে গিয়া মাকে দেখিয়া উহার যথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম এবং সেখানেই রহিয়া গেলাম দু'চার দিন। বেশ আনন্দেই কাটিল। কিন্তু তার পরই আশ্রমবাসীদের ভিতর বৈষম্য একটির পর একটি নজরে পড়িতে লাগিল। আশ্রমবাসে বীতরাগ হইয়া সেখান হইতে চম্পট দিয়া অনেক উঁচুতে হিমালয়ের একটি ছোট গুহায় গিয়া আশ্রয় নিলাম। আশে-পাশের সাধু সন্ন্যাসীরা আমাকে বলিলেন, "ও জায়গাটা নিরাপদ নয়, হিংস্র জন্তুর ভয় আছে, ইত্যাদি।" কিন্তু জীবনে যাহার বীতরাগ আসিয়াছে তাহার আবার ভয় কোথায়? আমি যে কয়টা দিন সেখানে ছিলাম ভয়ই আমাকে ভয় করিয়া চলিত। আমি যে গুহাটার ভিতর থাকিতাম তাহার সামনে পাঁচ-সাত হাত পরিমিত একটা পাথরের চাতাল ছিল এবং ঠিক তাহার নীচেই খরস্রোতা গঙ্গা। একদিন রাতে ঘুমের ঘোরে গুহা হইতে বাহির হইয়া সামনের চাতাল অতিক্রম করিয়া এমন একটি জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলাম সে স্থান হইতে আর এক পা অগ্রসর হইলেই গঙ্গাগর্ভে পতন ও নিশ্চিত মৃত্যু। এই সময় রাতের অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলাম মা আনন্দময়ী দুই হাত বিস্তার করিয়া আমার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দাদা, সেই অপূর্ব্ব, অশ্রুত করুণাঘন মূর্ত্তি আমার পাষাণ হৃদয়ে ইস্পাতের ফলকে খোদিত হইয়া আছে। সাধুটির নাম আমার মনে নাই, দাদাও ঘটনাটি স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীযুত তরুণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট জানিলাম, এই সাধুটি হয়ত আমাদের নিতাই দাদা।

আমার বৌদি স্বর্গীয়া ইন্দুপ্রভা ঘোষ ও তাহার ছোট বোন শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ দস্তিদার (উভয়ে গিরিমহারাজের চরণাশ্রিতা) তিন চারটি ছোট ছেলে মেয়ে নিয়া বহরমপুর (উরিষ্যা) হইতে কোথাও ট্রেনে যাইতেছিলেন—মাঝ পথে train বদলাইতে হইবে। Platform-এ ছেলে-মেয়ে ও দ্রব্য-সামগ্রী নিয়া পরবর্ত্তী train-এর

জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার বৌদি মাকে দিল্লী ও কলিকাতায় বহুবার দেখিয়াছেন, প্রতিমা কখন দেখে নাই তবে নাম শুনিয়া তাহার দেখার তীব্র আগ্রহ জাগিয়াছিল। তাহারা যে platform-এ ছেলেমেয়েদের নিয়া বসিয়াছিল তাহার opposite platform-এ ঝিক্ ঝিক্ করিয়া একখানি train in করিল। প্রতিমা মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, সে ট্রেনে মা আনন্দময়ী বসিয়া আছেন জানলার ভিতর দিয়া মুখ বাহির করিয়া। আর কোন কথাবার্ত্তা নাই, "দিদি, ঐ দেখ মা আনন্দময়ী", এই চিৎকার করিয়া ছেলেমেয়েদের ফেলিয়া মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বৌদি ভাবিলেন যাহার ছেলেমেয়ে সেই যখন সকল ভুলিয়া মায়ের নিকট চলিয়া গেল আমি বা কোন বাঁধনে এখানে বসিয়া থাকি। মায়ের গাড়ীখানা যতক্ষণ সময় platform-এ ছিল তাহারাও ততক্ষণ দাঁড়াইয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিল। ছেলেমেয়েদের কথা তাহারা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিল। যে টানে মা মাসী আপন ছেলেমেয়েদের কথা ভুলিয়া যায় সে টান কত বড় তাহা বলিয়া বুঝাইবার ভাষা আমার নাই।

পাঠক আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে মির্জ্জাপুরের ডাক্তার উপেনবাবুর (শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত) পরিচয় কিছু পাইয়াছেন। লোভের বশে তাহার সম্বন্ধে আরও একটি কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। ডাক্তার-বাবু call-এ বাহিরে গিয়াছেন। বাসায় ফিরিয়া একখানা চিঠি বা Telegram (ঠিক মনে নাই) দেখিতে পাইলেন, "মা বিন্ধ্যাচলে তাঁহার সহিত অবশ্য অবশ্য দেখা করিতে লিখিয়াছেন অতি প্রয়োজনী কথা আছে।" ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন first train ধরিতে হইলে তখনই রওয়ানা হওয়া দরকার। অযথা বিলম্ব না করিয়া তখনই station-এর দিকে ছুটিলেন, কিন্তু কোন ক্রমে train ধরিতে না পারিয়া বিমর্ষ হইয়া platform-এর একটি bench-এর উপর বসিয়া পড়িলেন। Station master

উপেনবাবুর পরিচিত। তিনি উপেনবাবুর অবস্থা অবগত হইয়া বলিলেন, "আপনি চিন্তা করিবেন না। অল্প সময়ের ভিতর একখানি goods train এই station দিয়া pass করিবে, আমি আপনাকে guard-এর van-এ উঠাইয়া দিব।" মালগাড়ীটি station-এ আসা মাত্র station master guard-কে বলিয়া তাহার গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন এবং guard-কে বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন, যাহাতে উপেনবাবুকে যথাস্থানে নামাইয়া দিতে ভুল না করেন। train চলিয়া গেল, উপেনবাবু নিশ্চিত মনে বসিয়া আছেন; guard ভদ্রলোক গেলেন সকল কথা ভুলিয়া। উপেনবাবুর খেয়াল হইতেই লক্ষ্য করিলেন goods train-টি যে station-এ দাঁড়াইবার কথা ছিল সে station-এ দাঁড়াইল না। উপেনবাবু পরের কথা বিবেচনা না করিয়া মায়ের নাম স্মরণ করিতে করিতে running train হইতে লাফাইয়া পড়িলেন একটা জঙ্গলের ভিতর। দু'চার পাক খাইয়া উপেনবাবু যখন উঠিয়া বসিলেন ডাক্তারের অভ্যাস মত হাত পা টিপিয়া দেখিলেন কোনরকম fracture বা sprain হয় নাই—দুই একটা জায়গা ছড়িয়া গিয়াছে মাত্র। আজ উপেনবাবুর কথা বলিতে গিয়া মনে পড়ে সনাতন গোস্বামীর কথা। তিনি তপ্ত বালুকা পথে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। গরম বালুতে পায়ে যে ফোস্‌কা পড়িয়া গিয়াছিল তাহার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

বহু বছর পূর্ব্বের ঘটনা। নাম ধামের সত্যতা সম্বন্ধে এখন কিছু কিছু সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু বিষয়-বস্তুর ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মায়ের এক ভক্ত ও তাহার স্ত্রী মায়ের আশ্রমেই তখন বাস করিতেন এবং তাহারা মায়ের সহিত বহু জায়গায় ঘুরিয়াছেনও বটে। ভক্তটির মতে কৃপা শব্দের অর্থ কর ও পাও—বিনা সাধনে কিছু পাওয়ার আশা নাই কিন্তু তাহার স্ত্রীর মত ছিল অন্যরূপ।

ন হি সাধন সম্পত্ত্যা হরিস্তুষ্যতি কর্ম্মবৎ
ভক্তানাং দৈন্যমেবৈকং হরিতোষণ সাধনম্।

(বল্লভাচার্য্য সুবোধিনীটীক)

অহঙ্কার দৃপ্ত সাধন সম্পত্তি দ্বারা ভগবানের তুষ্টি বিধান করা যায় না। কিন্তু দৈন্যবোধ ও উহার নিবেদন দ্বারা সম্ভব।

মনে হয় সেদিন কোন পুণ্য তিথি, রাতে মায়ের নিকট ভক্তবৃন্দ বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত প্রস্তাব করিলেন—কীর্ত্তন করিয়া রাতটা কাটান যায় না। এ বিষয়ে মায়ের সম্মতি পাইতে কিছু মাত্র বিলম্ব হইল না, তবে মায়ের একটি সর্ত্ত ছিল—এ সংবাদ যেন অমুক মাকে জানান না হয়, কেন না কীর্ত্তনের সময় তাহার শরীরের উপর কাল বৈশাখীর যে ঝড় বহিয়া যায় উহা সামলাইতে দুই চারিদিন সময় লাগে। মা বলিলেন, অমুক মায়ের ঘরের দরজাটায় বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিলে হয় না? এটি যে মায়ের আদেশ তেমন কেহ বুঝিতে পারিলেন না ও সে বিষয়ে তৎপরও হইলেন না। কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, উক্ত ভদ্র মহিলা একই বাড়ীতে রাত্রিবাস করিয়াও কীর্ত্তনের কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না, অধিকন্তু দেখা গেল তাহার দরজার শিকলটি বাহির হইতে লাগান আছে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে সকলে একবাক্যে বলিলেন, "আমি কিছু জানি না।" তাহারা না জানিলেও কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, উহার কারণ আমার যাহা মনে হয় তাহা ব্যক্ত করিতেছি। সুধীবর্গ ভাবিয়া দেখিতে পারেন। চৈতন্য সর্ব্বত্র, কোথাও ব্যক্ত চৈতন্য, কোথাও অব্যক্ত চৈতন্য। যিনি চৈতন্যের সাথে নিত্যযুক্ত তাহার ইচ্ছায় জড় বস্তুতে ব্যক্ত চৈতন্যের প্রকাশ হয়। বিস্ময়ের কিছু নয় এবং ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে পাইয়াছি। গোস্বামী প্রভুর নিকট টুল, টেবিল, বৃক্ষলতা, স্থাবরজঙ্গল, আদর-আবদার জানাইত। উহা সম্ভব হইলে শিকলটা আপনা-আপনি লাগিয়া যাইবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

ভাষায় বিভক্তি নিয়া বড় গণ্ডগোল এবং এই নিয়াই যত ধর্মীয় দলাদলি, কিন্তু যিনি ধর্ম্মগোপ্তা তিনি বিভক্তির উপরে। ভগবান দ্বারা, ভগবানে, ভগবান হইতে—সকল বিভক্তিগুলি তাহাতে আশ্রয় পাইয়া সকলে আপনহারা হইয়া যায়। আমাদের মা আনন্দময়ী কি হইতে বা কাহা দ্বারা কি করেন কোনটাই বোধগম্য নয়।

দিল্লীতে মায়ের ভক্তদের ভিতর হিন্দুস্থানী দুইটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে ছিল, একটির নাম বৈজনাথ অপরটির নাম গিরিধারী। উভয়ে যেমন ভক্ত তেমন কর্মী। মায়ের যে কোন উৎসব হইলেই দু'জনেই উপস্থিত থাকিত, বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হইলে। তাহারা লাল, ননী, শ্রীমন্তদার সাথে থাকিয়া কীর্ত্তন করিত এবং খোল বাজাইতেও শিখিয়াছিল, তাহাদের ছাড়া উৎসব জমিত না।

সে বছর নরেশদার (ভবানীর বাবা) বাড়ীতে (Reading Road)-এ মায়ের জন্মতিথি উৎসব। তিথি পূজা রাত দুপুরে কিন্তু সন্ধ্যার সময় হইতেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। আমি রাতের উৎসবে যোগ দিতে পারি নাই। পরের দিন অতি প্রত্যুষে যাইয়া দেখি গায়ক, বাদক সকলে ভাবে বিভোর, কি যেন গাম্ভীর্য্যে কীর্ত্তন আসর ভরপুর। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া সে কীর্ত্তন শুনিতেছিলাম ও ভক্তদের ভাব দেখিয়া মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছিলাম। তাহাদের আনন্দতরঙ্গ সমুদ্রোপকূলের ঢেউ-এর মত আমাকে এক একবার আসিয়া স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল। আমি আমার হাত দুইখানা পিছনে রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় একটা দুষ্ট না পাগল বলিতে পারি না, আমার পীঠমোড়া হাত দু'খানা ধরিয়া বড়ই ব্যথা দিতেছিল। তখন আমার সহিবার মত শক্তিও ছিল না, বলিবার মত ভাষাও ছিল না। হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। গিরিধারী সহসা ঐ লোকটার গলা ধরিয়া কোলে লাফাইয়া উঠিল ও বাঁদর ঝোলার মত ঝুলিয়া পড়িল। বিশ-বাইশ বছরের

পূর্ণবয়স্ক একটি ছেলে কাহারও গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলে যাহার গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে তাহার কি অবস্থা হয় সকলেই উহা অনুমান করিতে পারেন। লোকটা কোন রকমে ছেলেটির কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল আর ফিরিয়া আসিল না। তাই বলিতেছিলাম, মা কি ভাবে কাহা দ্বারা কখন কি করেন বুঝা শক্ত।

মায়ের লীলা বুঝি না বুঝি অনেক দেখিয়াছি। যাহা বুঝিয়াছি তাহাও বলিবার মত আমার ভাষা নাই। মুক কথা না বলিতে পারিলেও কথা বলার চেষ্টা করে আমিও তেমন চেষ্টা করিলাম মাত্র। অপর কেহ না হ'ক যাঁহারা মায়ের অধম সন্তান বলিয়া আমাকে স্নেহ করেন আশাকরি তাঁহারা এ মুকের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন।

—o—

(৪)

আজ আমি আমার পুরানো পাঠকবর্গকে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আর কয়েকখানি ছোট ছবি উপহার দিবার বাসনায় উপস্থিত হইতেছি। আমার ছোট Camera-র ছোট ছবি। আগ্রহশীল পাঠক ঐ ছবিগুলি enlarge করিয়া নেন তৃ' এক আধারে মায়ের কয়েকটি ভাব ও রূপের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

১৯৪৮ সনের ১২ই জ্যৈষ্ঠ মায়ের আবির্ভাব তিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হয় New Delhi-তে ভক্তি ভাজন স্বর্গীয় Dr. J. K. Sen মহাশয়ের Hanuman Road-এর বাড়ীতে। ৯ই জ্যৈষ্ঠ সেখানে মায়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় নাম যজ্ঞ। এদিন ছিল দুঃসহ গরম। অত্যধিক গরমে কীর্ত্তনীয়াদিগকে শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখিয়া মা পিচকারির সাহায্যে তাহাদের সকল শরীরে বরফ জল

ছিটাইয়া দিলেন। অবিলম্বে প্রবল বারি বর্ষণ আরম্ভ হইল। উহাতে সকলের শ্রম অপনোদন হইল বটে কিন্তু ইতিমধ্যে বর্ষার জল কীর্ত্তন মণ্ডপে দাঁড়াইয়া গেল। তখন সেই জল অপসারণের জন্য নামিয়া আসিলেন কয়েকটি পশ্চিম ভারতীয় অভিজাত পরিবারের মহিলা; তাঁহাদের ধবধবে শুভ্র শাড়ীর অঞ্চল কোমরে বাঁধিয়া। সেই মহিলাদের আনন্দ, উৎসাহ ও তৎসহিত অনভ্যস্ত হস্তে কীর্ত্তন মণ্ডপ কর্দ্দম মুক্ত করিতে গিয়া নাকে মুখে কাদা মাখিয়া যে আর্ত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন উহাতে লেখক তাহাদিগকে অন্তরে অন্তরে জানাইয়াছিল বারবার প্রণাম। রাতে কীর্ত্তনান্তে অন্যান্যের সহিত লেখকও সেদিনকার মত সেখান হইতে বিদায় নিল। বন্ধুবর জিতেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, ঐদিন আমি চলিয়া আসিলে পর খুকুনী দিদি মাকে খাওয়াইবার জন্য একটি বাটিতে পায়সান্ন নিয়া আসেন ঐ কীর্ত্তন মণ্ডপেই। দিদি মাকে খাওয়াইতে গেলে মা এক চামচ গ্রহণ করিয়া কি খেয়ালে দিদির হাত হইতে ঐ চামচখানি নিয়া দিদিকে এক চামচ পায়সান্ন খাওয়াইয়া দিলেন। তারপর তত্রস্থ বলিতে গেলে সবাই একে একে মাকে এক এক চামচ খাওয়াইয়া দিলেন এবং মাও তাহাদিগকে এক এক চামচ খাওয়াই দিলেন ঐ একই চামচের সাহায্যে ও একই পাত্র হইতে; কোথায় গেল ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, শুচি-অশুচি, রুগ্ন বা সুস্থের তারতম্য। সেদিন সেথায় আবির্ভূত হইয়াছিল জগন্নাথ ক্ষেত্র। এইরূপ কীর্ত্তন্যাদির সময়ে ধামের আবির্ভাব প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর মুখে তাহার শিষ্যবৃন্দ অনেকবার শুনিয়াছেন। যাহাহ'ক মায়ের অনুরূপ লীলা আমারও একবার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল New Delhi-র Mirdad Road-এ। সে ঘটনা কোন সালে ও কি উপলক্ষে ঘটিয়াছিল এখন আর তাহা মনে করিতে পারিতেছি না এবং সে উৎসবে উপস্থিত আমার পরিচিত ব্যক্তি অতুল বসু (Foreign & Political Deptt.) ও চারুদা বহুদিন হল বিদায় নিয়াছেন ধরাধামের মাটি হইতে।

(২) কাহারও মনে কখনও মাকে কিছু খাওয়াইবার সাধ জাগিলে তাহার অনেক কিছু বিবেচনা করিতে হয়। মায়ের জন্য যিনি খাওয়ার তৈয়ারী করিবেন তাহার জাত, গোত্র, দীক্ষিত কি অদীক্ষিত ময় চুলাচাটির মান। তারপর বিদুরের খুদের প্রতিবন্ধকতা পদে পদে। সেদিন কেরালবাগ ও প্যাটেল নগরের মাঝামাঝি মা তাঁহার এক ভক্তের বাড়ী অতিথি—মায়ের উপস্থিতিতে নাম যজ্ঞ অথবা নাম যজ্ঞ উপলক্ষে মায়ের উপস্থিতি দুইটির কোনটি কার্য্য বা কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ভক্তরা ঠাকুর মঞ্চের চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, মেয়ে ভক্তরা মাকে ঘিরিয়া বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। এমন সময় প্যাটেল নগরের Prof. স্বর্গীয় মহেন্দ্র কুমার সরকার মহাশয়ের মেয়ে গীতা (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য পূজনীয় কুমুদ বান্ধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যা) অনেক আশা ও আগ্রহ নিয়া মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। শুধু হাতে সাধু দর্শন করিতে নাই তাই তাড়াতাড়িতে আপন-ভোলা মেয়েটা অন্যকিছু সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহার গোপালের জন্য তৈয়ারী খৈর উপরা হইতে কয়েকটি উপরা বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া নিয়া আসিয়াছে। মাকে প্রণাম করিয়া বসিতেই মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঁচলে বাঁধিয়া কি নিয়া আসিয়াছিস্।" সে কথায় গীতার সন্ত্রস্তমনে সাহসের সঞ্চার হইল, আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া মায়ের মুখে দুই চারিটি খৈর উপরা দিয়া দিল—মাও উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সম্পর্কে মনে পড়িয়া গেল অপর একটি ভক্তের কথা।—কথাটি অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু মায়ের দরবারে ঠাঁই পাইবার যোগ্য মনে করি। সাধু দম্পতি দাদা ও মা (ইহারা গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভক্ত) মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উৎসব উপলক্ষে দেশ-বিদেশে তাহাদের ভক্ত সন্তানদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন। নিকটবর্ত্তী ধনী, দরিদ্র সকল ভক্ত যাহার যেমন শক্তি তরি-তরকারি, চাল, ডাল, নুন নানা সামগ্রী নিয়া আসিয়াছে নৌকা ভরিয়া। উহাদের ভিতর একটি ভক্ত

ছিলেন সুদরিদ্র। তাহার নিয়া আসার মত কিছুই ছিল না বরং অন্যান্য ভক্তরাই ব্যয়ভার বহন করিয়া তাহাকে নিয়া আসিয়াছেন তাহাদের সাথে। গুরুধাম পৌছিয়া নৌকা হইতে নামিবার সময় ঐ ভক্তটি নদীর চর হইতে কতগুলি শুকনা বালি গামছায় বাঁধিয়া লজ্জাবনত মস্তকে সকলের পিছনে পিছনে চলিলেন নিজের ও ঐ উপহার সামগ্রীটির আত্মগোপন ঘটাইয়া। এদিকে মা ঐ ভক্তটির নাম নিয়া ডাকা-ডাকি করিতে লাগিলেন, ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আরে অমুকে কোথায়? তাকে শিগ্‌গির ডাক। বালির অভাবে ঠাকুরের বাল্য ভোগের মুড়ি ভাজা হইতেছে না।" সকলে খোঁজাখুঁজি করিয়া মায়ের ঐ আদরের সন্তানটিকে ধরিয়া আনিলেন মায়ের নিকট। তখন তাহার শুকনো বালি চোখের জলে ভিজিয়া যাওয়ার উপক্রম।

(৩) কলিকাতার পরম ভাগবত বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা ও অনুবাদক স্বর্গীয় রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ীর দরজায় মা দাঁড়ানো। বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সে সংবাদ পৌছানোর উদ্দেশ্যে মায়ের এক ভক্ত সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বই-এর পাহাড়ের ভিতর ডুবিয়া আছেন। মায়ের ভক্তটি সংবাদটি পৌছাইয়া নীচে নামিবেন মায়ের সে তর সইল না। কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর মা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বই-এর পাহাড়ের অন্তর ভেদ করিয়া যেখানে বহিতেছিল গঙ্গার ধারা তাহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন এক অভিনব সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া। এ সম্বন্ধে মাকে প্রশ্ন করা হইলে, মা বলিয়াছিলেন, "কি জানি বাবা! একটা হাওয়া এসে যেন এ শরীরটাকে একটা শুক্‌নো পাতার মত উড়িয়ে নিয়ে গেল।" জিজ্ঞাসা করি ঝড় নাই, হাওয়া নাই, গাছের পাতাটা পর্য্যন্ত নড়িল না, তবে সে কোন হাওয়া যাহা একটি সুস্থ সবল মানুষকে উড়াইয়া নিয়া গেল সেই অজানা অচেনা এক গৃহস্থ বাড়ীর দ্বিতলের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে।

(৪) পঞ্চুদার বিশেষ আগ্রহে একবার নাম যজ্ঞ উপলক্ষে দেরাদুন যাইতে বাধ্য হইলাম। সেখানে নারায়ণ স্বামীর (তখন তিনি সন্ন্যাসী নন, ব্রহ্মচারী) সাথে কথাবার্ত্তা বলিবার একটু সুযোগও আসিয়াছিল (মনে হয় বন্ধুবর শ্রীযুত হরিদাস গাঙ্গুলীর সঙ্গগুণে) নারায়ণ স্বামীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম; মায়ের প্রত্যেক ভক্তের জীবনে মায়ের করুণা স্পর্শ লাভের স্ব স্ব এক বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা শুনা যায়। আপনার বলিতে আপত্তি না থাকিলে সে সম্পর্কে কিছু বলিলে বিশেষ সুখী হইব। উত্তরে নারায়ণ স্বামী বলিয়াছিলেন—সে ঘটনা ঘটিয়াছিল কাশীতে। (কাশীতে তখনও মায়ের আশ্রম হয় নাই, স্থানটি বোধ হয় দানবীর ৺মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ধরমশালা) একদিন মাকে নিয়া মেয়ে ভক্তরা একটি ঘরে বসিয়া আনন্দ করিতেছিলেন। এমন সময় উহাদের ভিতর হইতে একটি মহিলা আমার ঘরে আসিয়া (আমার ঘরখানা উক্ত ঘরটির পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের পরবর্ত্তী ঘর) বলিলেন, "দাদা, এবার মেয়েদের ভাগ্য অনুকূল; মাকে নিয়া এমন আনন্দ করা আপনাদের বরাতে এবার জুটিল না।" ঐ কথা শুনিবা মাত্র মা যে ঘরে ছিলেন সে ঘর হইতে মাকে কোলে করিয়া উঠাইয়া নিয়া আসিলাম আমি আমার ঘরে, একরাশ স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে। আমার তখন স্ত্রী পুরুষের কোন ভেদ জ্ঞান ছিল না যদিও আমি তখন এক পূর্ণ বয়স্ক যুবক এবং আমার ও মায়ের বয়সের তফাৎও তেমন কিছু বেশী নয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় মায়ের শরীরটি বহিয়া আনিতে আমার কোনই শারীরিক পরিশ্রম বোধ হইল না, পরন্তু মনে করিলাম একটি সুকুমার শিশুকে এক অনির্ব্বচনীয় সোহাগ ভরে কোলে তুলিয়া নিয়া চলিয়াছি।

(৫) এ ঘটনা ঘটিয়াছিল ১৯৫৬ কি ১৯৫৭ খ্রীঃ-এ আমার দিল্লী ছাড়িয়া আসার পূর্ব্বে। শুনিতে পাইলাম দিল্লী হইতে Bus-এ মীরাট যাওয়ার পথে মোদীদের একটি বাগান বাড়ীতে মা

আসিয়াছেন ; মায়ের সাথে আসিয়াছেন কয়েকটি উচ্চ কোটির সাধক ও ভক্ত। তাহাদের ভিতর শ্রীমৎ হরিবাবাও আছেন। সেখানে কয়েকদিন ধরিয়া উৎসব চলিতেছে ও চলিবে, মাকে দেখার জন্য একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিল। Jangpura-এ শ্রীমন্তদার সংবাদ পাইলাম তিনি ঐ উৎসবে যাইতেছেন তবে ভোরের দিকের রুগী দেখিয়া। তিনি সবেমাত্র Practice করিতে বসিয়াছেন ; এ সময় শৈথিল্য দেখান উচিত হইবে না। আমার বহুদিনের সাথী অতুল চ্যাটার্জী—তিনি তাহার নিত্য কর্ম্মের সময়টাকে কোন অবস্থায় হ্রাস করিতে রাজী নন। দ্বিতীয় সাথী পিনাকপাণি চ্যাটার্জী কয়েক বছর হল এ দুনিয়ার মাটি ছাড়িয়া গিয়াছেন। তৃতীয় সাথী চৌধুরী মহাশয়কে (শ্রীযুত গঙ্গা প্রসাদ চৌধুরী, জীবন্মুক্ত পুরুষ নিত্যগোপাল অবধূতের প্রশিষ্য) নিয়া Old Delhi Rly. Station হইতে মিরাটগামী এক Bus-এ আরোহণ করা গেল। জানা না থাকায় গন্তব্য স্থানের কিছু আগেই Bus হইতে নামিয়া পড়িলাম ও তত্রস্থ পথচারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, "মা যেখানে আছেন তাহার সন্ধানের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ নিষ্প্রয়োজন—বিলকুল সোজা শরক ; মাতাজীকা আগমনে এক ভারী শহর বন গিয়া।" বাস্তবিক আমরা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া লোক কোলাহল অনুসরণ করিতে করিতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া তত্রস্থ বিস্তৃত প্রান্তর ও তদনুরূপ ব্যবস্থাদি দর্শনে বিস্মিত হইলাম, মনে পড়িয়া গেল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের একটি পয়ার।

বিনা দানে যার পাছে এত লোক হয়।
সেইত গোঁসাই—ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

মপ-প-১৬৮

উৎসব স্থলের বাঁকে বাঁকে যে নির্দ্দেশ চিহ্ন ছিল উহাকে লক্ষ্য করিয়া মায়ের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইতেই সহসা আমাদের গতি একটা ঝাকুনি খাইয়া স্তম্ভিত হইল, Brake টানা গাড়ীর মত—

বাড়ীর নেপালী দারওয়ানের একটি কথায়, "অন্দর মৎ যাইয়ে।" নিরুপায় মনে করিয়া মায়ের বহিরাগমন প্রতীক্ষায় রোদের ভিতর ঘণ্টাখানেক ঘুরাঘুরি করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। রিক্ত হস্তে তিক্ত মনে ফেরার পথে মায়ের দরজায় একটি প্রণাম করিয়া আসার উদ্দেশ্যে যেমন উপস্থিত হইলাম ঠিক তখনই মায়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া দিল্লীর ননী আমাদিগকে ভিতরে নিয়া গেল। মায়ের দর্শনে ক্লান্ত শরীর ও মন উভয়ে বিশ্রাম লাভ করিল; শূন্য হৃদয় আশা ও ভরসায় ভরিয়া উঠিল। কিছু সময় পরে মা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া কীর্ত্তন মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলেন ও আমাদের দুই জনাকেই ডাকিয়া তাহার সঙ্গে নিলেন। (ইত্যবসরে আরও একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল—কর্ত্তৃপক্ষের কেহ আমাদিগকে ভোজনালয়ে নিয়া সাদরে পুরি, তরকারী লাড্ডু ভোজন করাইয়া দিলেন—সেখানে কিন্তু দেখিয়াছিলাম—বসুন্ধরার সকলেই কুটুম্ব।) মা কীর্ত্তন মণ্ডপের Platform-এর উপর উঠিয়া আমাদের দুই জনাকেই আদেশ করিলেন, "হরিবাবার কীর্ত্তনের পাশে দাঁড়াও।"

হরিবাবা গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় সুপুরুষ পাঞ্জাবী কিন্তু গৌর-অনুগত প্রাণ। তাঁহার তপ ও নিষ্ঠা রঘুনাথের কথা মনে করাইয়া দেয়। তিনি হাতে একটি সের-পাঁচেক ওজনের কাঁসার ঘড়ি (পেটাবার ঘণ্টা) নিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে কি দৃশ্য, আজও তাহা মনে পড়ে। পরে শ্রীমন্তদার নিকট শুনিয়াছিলাম—ঐদিন প্রাতেই মা তাঁহার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং ঐদিন বাসায় না থাকায় তাহার যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল মা তাহা সুদে আসলে বহুগুণে মিটাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার সারা জীবনের কোন একক দিনে তেমন আয় তাহার কখন হয় নাই।

(৬) যতদূর মনে করিতে পারি মায়ের সামনে বসিয়া খুকুনীদির মুখে শুনিয়াছিলাম—লছমণঝোলা বা হৃষীকেশে মায়ের একদিন খেয়াল হইল গঙ্গাগর্ভে বসিয়া সকলে মিলিয়া আহারাদি করিলে

কেমন হয়। তীরের অদূরে জলমগ্ন নয়, জলে ছুঁই ছুঁই এমন একখানা পাথরের চাতালকে ধুইয়া মুছিয়া ঝক্‌ঝকে করা গেল। উহার উপর আটা মাখা, বেলা, সেকা, ভোজন ক্রিয়া অবধি শেষ হইল—আনন্দে কৌতূহলে—সে যেন বৃন্দাবনের পুলিন ভোজন। যখন সকলে গৃহে ফিরিলাম, মা বলিলেন, "যে পাথরখানার উপর আটা মাখা, বেলা ইত্যাদি হইয়াছিল উহার চুল চুল প্রত্যেক ছোট ফাটলের ভিতর ময়লা ঢুকিয়া আছে—যাহা তোমরা তখন লক্ষ্য করিতে পার নাই। জল পাইয়া সকলে সগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছে—তোমরা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে।" তখন পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল মায়ের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। এটি মায়ের একটি বহু বর্ণ রঞ্জিত চিত্র ; আপাততঃ দৃষ্টিতে যাহা প্রতীয়মাণ হয় তাহার একটি মা আমাদের শুচি-অশুচি, পবিত্রতা ও অপবিত্রতার উর্দ্ধে; শাস্ত্রের বাধা নিষেধ তাহার মানিয়া চলা আমাদের ভোগান্তি লাঘবের জন্য। দ্বিতীয় কথা কে জানে কোন ভক্তের মনের কোণে দেখা দিয়াছিল সেবা অহঙ্কার। উহাতে প্রত্যক্ষ আঘাত না করিয়া মা উহা বুঝাইয়া দিলেন পরোক্ষে।

নিবাস শয্যাসন পাদুকাংশুকোপাধান
বর্ষাতপবারণাদিভিঃ
শরীর ভেদৈরবশেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ
ইতীরতোজনৈঃ।

শ্রীসঙ্কর্ষণ নিবাস শয্যা আসন পাদুকা প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভগবানের সেবা করেন।

মানুষের সাধ্য কি ইষ্ট ও গুরুর সেবা করে আপন সাধন সম্পত্তিদ্বারা।

—o—

(৫)

আমার লেখা একরকম শেষ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মায়ের কথার তো আর শেষ নাই। তাই আবার লিখিতেছি—অবশ্য মায়ের কতিপয় ছেলে-মেয়ের আগ্রহে। তবে মায়ের কথা লিখিতে বসিয়া আজ আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কথা লিখিব যিনি মাকে পাওয়ার পথ পূর্ব্বেই সুগম করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি হলেন ভোলানাথ। ভোলানাথের পরীক্ষা ও প্রচেষ্টার ফলে কাহারও পুনর্ব্বার বইএর পাতা উল্টানোর দরকার হয় নাই। মাও তেমনই ভোলানাথকে বর্ষার বারিধারার মত ঢালিয়া দিয়াছেন অজস্র। ভোলানাথ ও মায়ের লৌকিক সম্বন্ধটি ছিল স্বামী-স্ত্রী—কিন্তু সে সম্বন্ধটি নদীর surface current সদৃশ, প্রকৃত সম্বন্ধটি নদীর unknown under-current, যাহা লোকচক্ষে ধরা পড়িয়াছে অনেক পরে।

ভোলানাথ, ভোলানাথের মত উদার ছিলেন—তাঁহার ভিতর if and but-এর প্রভাব খুব কমই ছিল। New Delhi, Hanuman Road-এ শ্রদ্ধেয় ডাঃ জে. কে. সেন মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিকটে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামে মায়ের এক ভক্ত ছিলেন (এখন তিনি কল্যাণী শহরবাসী)। এক সময় ভোলানাথ হরিদ্বার যাওয়ার পথে এক রাত ও একদিন নরেনবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। ঐ সময় ভোলানাথকে New Delhi কালী বাড়ীর হরিসভায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভোলানাথ ছিলেন কীর্ত্তনপ্রিয়—খোলখানি হাতে পাইলে সকল কথা ভুলিয়া যাইতেন। ভোলানাথ নাচিয়া কুঁদিয়া খুব কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনান্তে চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ীতে কাল মাকে অন্নভোগ দেওয়া হইবে, যাঁহারা প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দুপুরে আমার বাড়ী যাইবেন।" নিমন্ত্রণের কায়দাটি ভোলানাথের তৃপ্তিকর বোধ হইল না। তিনি চৌধুরী মহাশয়কে

একটি ধমক দিয়া বলিলেন, "এরূপ ভাবে নিমন্ত্রণ করিলে কে তোর বাড়ী যাইবে রে। দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া বল্, "কাল আমার বাড়ীতে মায়ের অন্নভোগের আয়োজন হইয়াছে, আপনারা সকলে দয়া করিয়া উৎসবে যোগদান করিবেন ও প্রসাদ লইবেন।"

এক সময় মা ও ভোলানাথ বৃন্দাবন রাধাকুণ্ডে যান। তত্রত্য ধূনী আশ্রমের সেবায়েত ও প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যা ব্রজমায়ী সর্ব্বতী দেবী মায়ের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ধূনী আশ্রমে একটিবার আসার জন্য মাকে সানুনয় আহ্বান জানান। ভোলানাথ রাজী হইলেন না, সুতরাং মায়ের আসাও স্থগিত রহিল। ঐ আশ্রমের দীর্ঘ দিনের একনিষ্ঠ সাধক প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ রায় মহাশয় ঐ সংবাদ জানিয়া ব্রজমায়ীকে বলিলেন, "ভোলানাথকে গিয়া বল—আমি আপনাকে আমাদের আশ্রমে আসার জন্য অনুরোধ করিতেছি না, এখানে উন্মুক্ত গগন-তলে বসিয়া প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দিনরাত ধূনী তাপিতেন, তাই এই পবিত্র ক্ষেত্রে আপনাকে আসার জন্য দ্বিতীয়বার আহ্বান জানাইতেছি।" ব্রজমায়ী গিয়া ভোলানাথকে ঠিক ঐ কয়টি কথাই জানাইলেন। ভোলানাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া অবিলম্বে মাকে নিয়া ধূনী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভয়দার মুখে শুনিয়াছি মাও একদিন "গোঁসাই বড় দয়াল" এই কথা বলিয়া কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়া ছিলেন। অপরপক্ষে গোঁসাই শিষ্যগণ যথা পূজনীয় দরবেশজী (নাম করিতে করিতে যাহার শরীরে নাম ফুটিয়া উঠিত), স্বর্গীয় মাখন লাল গাঙ্গুলী (Advocate, Calcutta High Court, যিনি কিছুদিন মায়ের সঙ্গে ছিলেন)। চিরকুমার স্বর্গীয় রেবতী মোহন সেন (যাহাকে "কি নিবি, কি নিবি" বলিয়া গোঁসাইজী অঙ্গ হইতে খুলিয়া বহির্ব্বাসখানি দিয়াছিলেন এবং যে বাবার কোলে গিয়া মা একদিন আদর করিয়া বসিয়াছিলেন) মায়ের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন উহার দৃষ্টান্ত খুব বেশী

আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইং ১৯৩৬ সনে মা যখন পুরী ধামে যান তখন দরবেশজী ও মাখনবাবু মাকে গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দিরের ভিতর নিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে মা ব্যতীত দ্বিতীয় মেয়েছেলে আজ পর্য্যন্ত প্রবেশের অধিকার পান নাই। মা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যখন বাবা আমি আসিয়াছি বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন তখন পিতা-পুত্রীর সাক্ষাৎ মিলনে উপস্থিত ভক্তবর্গের প্রতি রোমে জাগিয়াছিল এক অপূর্ব্ব আনন্দ শিহরণ। যাহাহোক একগুঁয়ে হইলেও কারণ দর্শাইতে পারিলে ভোলানাথ তাহার মত ও পথ পরিবর্ত্তন করিতে মোটেই দ্বিধা বোধ করিতেন না। ভোলানাথের অনুভূতি ছিল গভীর সুতরাং সন্দেহ রহিত। একদিন সাধনে বসিয়া ভোলানাথ হঠাৎ সাপ সাপ বলিয়া চীৎকার পারিয়া ওঠেন—সেটি কিন্তু ছিল সর্পিল গতিতে জাগ্রত কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির ঊর্দ্ধগতি।

এখন দেখা যাক্ ভোলানাথের অল্প বা বিস্তর যাহা কিছু প্রাপ্তি উহার উৎস কোথায়।

ভোলানাথ এক সময় মাকে বলিলেন, "ঘোরা-ঘুরি না করিয়া আমার একটি জায়গায় বসিয়া একটু সাধন ভজন করিতে ইচ্ছা হয়।" মা ভোলানাথের সে সাধ অপূর্ণ রাখিলেন না। ঘটনাচক্রে মা ও ভোলানাথ একবার তারাপীঠ যান। ঐ জায়গাটি ভোলানাথের সাধন অনুকূল বলিয়া মনে হইল, ভোলানাথ সেইখানেই সাধনে ব্রতী হইলেন। মা ভোলানাথের সেবার জন্য কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীকে তারাপীঠে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কিছুদিন পর মা তারাপীঠে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন—ভোলানাথ সাধনে মগ্ন, সর্ব্ব অঙ্গে এমন মাছি বসিয়াছে যে শরীরের 'ত্বক' আর দেখা যায় না—ভোলানাথের উহাতে হুঁস্ নাই। মা তদবস্থায় কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীকে বলিয়া ভোলানাথের উপর সেদিন হইতে একখানি মশারি খাটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভোলানাথ তথায়

সামান্য আহার ও শৌচাদির সময়টুকু বাদে প্রায় সকল দিনটাই সাধনায় ডুবিয়া থাকিতেন—সাধনের সময় তাহার শরীর হইতে একটা জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইত। রায়পুর থাকাকালেও ঐরূপ ঘটিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়।

ভোলানাথ মায়ের নিকট দীক্ষা পান ১৩২৯ সনের (১৯২২ খৃঃ) ১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার। ভোলানাথের দীক্ষা সম্বন্ধে মা মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে যেরূপ বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ ঃ—আমি ত' দীক্ষা সেভাবে দেয় নাই। কি রকম হইয়াছিল জান? আসনে ভোলানাথকে বসিতে বলিলাম। তখন আমার ভিতর যে নাম হইতেছিল সে নামটি শ্বাসে শ্বাসে খুব জোরে জোরে হইতে লাগিল। ভোলানাথ এই দেহের মুখের কাছে তাহার কান নিজে আনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ শুনিয়াছি। "আমি কিন্তু নিজে কিছু বলি নাই বা ডাকিও নাই। ইহার মধ্যে একবার আমি হয়ত হাত দিয়া ভোলানাথের হাত ছুঁইয়াছিলাম।" খোদ মায়ের নিকট (not through any medium) দীক্ষা পাইয়াছেন এমন দাবীদার অবশ্য কতিপয় আছেন। কিন্তু মা যেমন ভোলানাথের দীক্ষার কথা স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন অন্য কাহারও সম্বন্ধে তেমন ব্যক্ত করিয়াছেন কিনা আমার জানা নাই। দ্বিতীয় কথা, আমি যাহা বুঝি, ভোলানাথ তাহার সংস্কার বশতঃই মায়ের মুখের নিকট কান নিয়া গিয়াছিলেন; ভোলানাথ ঐরূপ না করিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিলেও তাঁহার নাম শুনার কোন বাধা হইত না।

ভোলানাথের সন্ন্যাসের গুরুও মা। সে দীক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন মানস সরোবরে, ১৩৪৪ সনের (১৯৩৭ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসে। এখানেও ভোলানাথের দীক্ষায় কিছু নূতনত্ব আছে। দীক্ষা প্রার্থী ছিলেন ভাইজী। ভাইজীকে মা সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন। ভোলানাথ তথায় উপস্থিত ছিলেন—তিনি বলিলেন, "আমারও

হইয়া গেল।" সুতরাং কেহ সন্দেহ করিতে পারেন ভোলানাথের সন্ন্যাস দীক্ষা একটা পরে পাওয়ার ব্যাপার নয় ত'? না, সে সন্দেহ অলীক কেননা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের কুম্ভমেলার সময় ভোলানাথ যখন কুম্ভস্নানে যাইতেছিলেন তখন মা তাহাকে বলিয়া দিলেন, "তোমার সন্ন্যাসের মন্ত্র স্মরণ করিয়া গঙ্গায় ডুব দিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে ভোলানাথ যাহা পাইয়াছিলেন, পাইয়াছিলেন তাহার অধিকার সূত্রে। ইহার পরও যদি কেহ প্রশ্ন করেন—"মা ঐরূপভাবে দীক্ষা দিলেন কেন?" তাহার উত্তর—সংসারী জীবনে মা ভোলানাথকে যে গুরুত্ব দিয়াছিলেন মা সে গুরুত্ব কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই—দীক্ষা ব্যাপারেও নয়। যজ্ঞ শেষে স্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাওয়াকে বলে অবভৃথ। ভোলানাথের এই কুম্ভস্নানকে অবভৃথ বলা যাইতে পারে। ইহার পরই ভোলানাথ দুরন্ত বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। মা তখন তত্রত্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে স্থানান্তরের আদেশ দিয়া ভোলানাথের ভার নিজ হাতে লইলেন। ভোলানাথও ঠিক অসহায় শিশুটির মত আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সঁপিয়া দিলেন শ্রীগুরু চরণ প্রান্তে এবং চলিয়াও গেলেন মা, মা বলিয়া। সেদিন ছিল ১৩৪৫ সন (১৯৩৮ খ্রীঃ) ২৩শে বৈশাখ শুক্রবার।

সাধন জগৎটি সাধ্যের মত বৃহৎ। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভোলানাথ সাধনের কোন স্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন উহা মা-ই বলিতে পারেন।

এখন মায়ের কথার অবতারণা করা যাক্। তবে আপনারা পূর্ব্বাহ্ণেই জানিয়া রাখুন নিছক মায়ের কথা বলিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আকাশের কথা বলিতে গিয়া গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আকাশের পরিচয় দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। এগুলি বাদ দিয়া বলিতে গেলে নভমণ্ডলকে শুধু শূন্য, শূন্য, মহাশূন্য ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না। মা একদিন অবশ্য ভগবানের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন শূন্য,

শূন্য—মহাশূন্য। কিন্তু উহার পর প্রশ্নকর্ত্তার আর কিছু জ্ঞাতব্য বা শ্রোতব্য ছিল না। ভক্তের পিয়াসী প্রাণ উহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। প্রেম ও প্রেমের বিষয় চির বর্দ্ধনশীল।

আমরা দেখিয়াছি নাম-যজ্ঞের অধিবাস হইয়া গেলে মা নাম-যজ্ঞ মণ্ডপেই রাত্রিবাস করিতেন। সেদিনও মা অধিবাসের পর যজ্ঞ মণ্ডপে শুইয়া আছেন, মায়ের ছেলেরা মাকে ঘিরিয়া পড়িয়া রহিলেন যে যেখানে পারেন, ঝড়ে পড়া আমের মতো। প্রভাত হইলে মায়ের জুতা জোড়া আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এদিক-সেদিক খোঁজা-খুঁজি করিতে করিতে দেখা গেল রণবাবু মায়ের চটি দু'খানি গেঞ্জির ভিতর সযত্নে লুকাইয়া বুকে করিয়া ঘুমাইয়া আছেন—সুখে ও স্বচ্ছন্দে। এই রণবাবু মায়ের কোন একটি কাজ নিয়ে কাশী যান। রণবাবুর স্ত্রীও তখন তথায় ছিলেন। রণবাবুর বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়—পূর্ণ যৌবন, যেহেতু মায়ের কাজে নিয়োজিত, কাশী থাকিয়া যথেষ্ট অবসর থাকা সত্ত্বেও রণবাবু তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্য্যন্ত আবশ্যক বোধ করিলেন না। মায়ের এরূপ ছেলেরা যাহাদের কথা আজ আলোচনা করিতে যাইতেছি তাহারা সন্ন্যাসী নন, মা-পাগল। তাহাদের মাতৃভক্তির ঘনীভূত সত্তায় ভোগ লালসা সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।

মায়ের অনুগৃহীত এক পাঞ্জাবী পরিবারের কথা বলিতেছি, শুনুন। তাহারা বাপ-বেটায় পাঁচটি লোকের পরিবার। ভ্রাতৃচতুষ্টয় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—ভাগ্যবান পিতার নাম জানা নাই। সবাই মাতৃগত প্রাণ। ক্ষেত-খামারও করেন, চাকরি-বাকরিও করেন (ইহার ভিতর দুইটি ভাই Graduate ; School Master ছিলেন)। তাহাদের জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে যে পাঞ্জাবের দুপুর রোদের ভিতর ক্ষেত-খামারের কাজ সারিয়া আহার করিতে যাইবেন এমন সময় গুরুদেবের বাণী শুনিতে পাইলেন, "আসনে বস।" রুটি তরকারি রহিল ঢাকা, তাহারা বসিয়া গেলেন জপে। ইহাকে বলে

গুরু আনুগত্য। গোঁসাইজী বলিতেন, "গুরু আনুগত্য লাভ হইলে সাধনের আর বাকী রইল কি?" ঠিক মনে নাই, বোধহয় মা একসময় বন্ধুবর জিতেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "গুরু-আনুগত্য দেখিতে চাও ত' সতীশ বাবাকে দেখিয়া আস।" পূজনীয় সতীশ মুখোপাধ্যায় (ইতিহাস প্রসিদ্ধ Dawn Society-র প্রতিষ্ঠাতা ও Dawn English Paper-এর Editor) গুরুদেব প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর আদেশ ব্যতীত ঘরেরও বাহির হইতেন না। যাহাহোক উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের ভরত ও লক্ষ্মণকে দিল্লীতে আমার দেখার সুযোগ হইয়াছিল। মা একসময় ভরত কি লক্ষ্মণকে (ঠিক কাহাকে আমার মনে নাই) একখানি চিঠি দিয়া শ্রীমৎ হরিবাবার নিকট পাঠাইলেন জবাব নিয়া আসিতে। পত্র-বাহক গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া প্রণামান্তে স-সম্ভ্রমে পত্রখানা হরিবাবার হাতে তুলিয়া দিলেন। পত্রের জবাব তৎক্ষণাৎই মিলিল না, পত্রবাহককে সে জন্য কিছু অধিক সময়ই অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না হরিবাবার চিঠিখানা পত্রবাহকের হস্তগত হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত সে সেস্থান হইতে এক পা'ও নড়িলেন না— ট্রেনের পথশ্রম বা প্রাতঃকৃত্যাদি কোন বিষয়ে তাহার কোন খেয়াল ছিল না। ধন্য মায়ের স্বভাব সরল ভক্ত। এ সম্পর্কে মায়ের নিজের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। মায়ের মুখে শুনা কথা, আপনারাও শুনিয়াছেন নিশ্চয়। দিদিমা মাকে একটি পাথরের বাটি পুকুরের ঘাট হইতে ধুইয়া নিয়া আসিতে বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন, "পারত' বাটি-টি ভাঙ্গিয়া আনিও।" যে কথা সেই কাজ। মা বাটি-টি ধুইয়া আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া সযত্নে টুক্‌রা কয়টি নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হয়ত সে আননে সাফল্যের হাসিও ছিল। এখন বলুন ত' কাহার পানে তাকাই—মা না তার ছেলের পানে।

এই সঙ্গে এক হতভাগ্যের কথাও জুড়িয়া দিতেছি যেমন ষ্টীমারের পেছনের গাদা বোট। মা একদিন আমাকে বলিলেন, "তুমি ত'

বেশ গান কর, তুমিই না হয় গাও।” গানের তাল মান আমার কোন দিনই নাই, বোধহয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও ছিল না। আমি লজ্জাবশতঃ মায়ের কথা শুনিয়াও না শুনার মত নির্ব্বাক রহিলাম। জীবনে সে সুযোগের অপব্যবহারের ফলে আজ আমি মোটেই গান করিতে পারি না, যদিও প্রথম জীবনে তাল-বেতালে গান গাহিয়াও আনন্দে ডুবিয়া যাওয়া আমার পক্ষে একটি সহজ সাধ্য ব্যাপার ছিল। আমি যাহা বুঝি আমার মত ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার মত যোগ্যতাটুকুও নাই, তিনি দিতে চাহিলেও নেওয়ার মত ক্ষমতা নাই। মা একদিন কতিপয় ভক্ত সমক্ষে বলিয়াছিলেন, “তোমরা এই present moment-এ কে কি ভাবিতেছ আমাকে মন খুলিয়া বল।” উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেহ কেহ সে স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন, কেহ কেহ একেবারে নীরব রহিলেন। বৈদ্যের নিকট পচা ঘা উন্মুক্ত করিয়া দেখাইবার সৎসাহস দুনিয়ায় বিরল। তবে একথাও স্বীকার না করিয়া পারি না, হাত পাতিয়া নেওয়ার বুদ্ধিও পূর্ব্ব জন্মের এক সুকৃতির ফল। দেরাদুন (রায়পুর) আশ্রমে গিয়াছি, দ্বিতলের passage-এ আমরা কয়েকজন মায়ের সাথে পায়চারি করিতে ছিলাম (আমি সকলের পিছনে)। এক মহিলা ভক্ত একটি কলার খোসা ছাড়াইয়া মায়ের মুখের নিকট ধরিলে মা পুরো কলাটি মুখে নিয়া ছুটিতে ছুটিতে passage-এর অপর প্রান্তে আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন—আমি হাত পাতিলেই আমার হাতে দেন এইভাব। কিন্তু আমি হাবার মত দাঁড়াইয়া রহিলাম, যাহার ভাগ্যে ছিল তিনি দৌড়িয়া আসিয়া লুফিয়া নিলেন। ইনি শ্রীযুত হরিদাস গাঙ্গুলী। অন্য এক ভাগ্যবানের কথাও জানিও রাখুন। এই ভদ্রলোকটি ইংরেজ, নাম পাল্টাইয়া হইয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম। আলমোরায় কৃষ্ণপ্রেমের একটি আশ্রম ছিল। তিনি আলমোরা হইতে বৃন্দাবন আসিয়াছেন, তাঁহার সাধ জাগিল মাকে একটি গান শোনাবেন। ভাবনানুযায়ী ফল, মায়ের দর্শন

পাইয়া গেলেন বৃন্দাবনে বর্দ্ধমান মহারাজের ধর্ম্মশালায়। তিনি মাকে গান শুনাইলেন, "মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ই মরিব, কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব।" কোন দেশের লোক কোন পূণ্য বলে ভারত ভূমিতে আসা ও মায়ের সেবার অধিকার পাওয়া এ সকল ভাবিলে তাঁহাকে ভাগ্যবান না বলিয়া মহাভাগ্যবান বলাই উচিৎ।

ঐদিনই মায়ের একটি অনন্য সাধারণ ভাব দেখিয়াছিলাম যাহা আমার চোখে আর কখন পড়ে নাই। শুনিয়াছি অশরীরি মহাত্মারা আসিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। মায়ের ঐ ভাবটি দেখিয়া আমার সে কথাই মনে পড়িতেছিল—ইহার চেয়ে বেশী কিছু আমার বলার নাই।

New Delhi Irwin Hospital-এর এক ডাক্তারকে দেখিয়াছি। অল্প বয়স, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, ফুট্‌ফুটে তার রঙটি। তিনি হরিদ্বারে একদিন মায়ের হাত-মুখ ধোয়ার জল দ্বিতলের নর্দ্দমার মুখ হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাহার নীচে দাঁড়াইয়া স্নান করিয়া সকল মালিন্য দূর করিয়া নিয়াছিলেন।

—o—

(৬)

মায়ের নিকট বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতব্যক্তি আসিয়াছেন কিন্তু কথায় মায়ের সাথে পারিয়া উঠিয়াছেন এমন কখনও কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই। বড় বড় পণ্ডিতের কথা আমি বুঝিও না, বলিতেও পারি না। তাই একটি সহজ সরল মেয়ের কথা বলিতেছি। পাঁচকুইয়া রোডের আশ্রমে আসিয়া মেয়েটি মাকে দেখিবামাত্র অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। মা যেমন একটু তাহার দিকে তাকায় মেয়েটিও তেমন বেশী করিয়া কাঁদিতে থাকে—মায়ের প্রতি চাহনিতে মেয়েটি যেন তাহার কোন পুরোণো বন্ধুকে ফিরিয়া ফিরিয়া

পাইতেছিল তাহার বুকে নিবিড় নিবিড়তর ভাবে। জন্ম-জন্মান্তরের পুরোণো বন্ধুকে ভক্ত এমনি করিয়া চিনিয়া নেয় বুদ্ধি বিবেচনার মাপ কাঠিতে না মাপিয়া। (নিসর্গঃ স্থদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে। তত্ত্বদ্বোধস্তহেতুঃ স্যাদ্ গুণ রূপ শ্রুতির্মনাক)। স্থদৃঢ় অভ্যাসবশতঃ যে সংস্কার তাহার নাম নিসর্গ। ভগবদ্ বিষয়ক রূপ গুণ শ্রবণাদি ঐ নিসর্গকে কখন কখন কথঞ্চিত উদ্বুদ্ধ করে কিন্তু জন্মান্তরীয় স্থদৃঢ় সংস্কার জনিত যে রতি উহা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রেম বা তীব্র বৈরাগ্য উভয়ই সাধকের জন্মান্তরীণ সাধনের ধন।

মেয়েটি একটু আত্ম সম্বরণ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমার বাড়ী কোথায়?

মেয়ে—আমার বাড়ী মা খড়দা, শ্যামস্থন্দর ঠাকুর বাড়ী।

মা—আমি সেখানে গিয়াছি।

মেয়ে—আমি সে সংবাদ পাই নাই মা। আবার যখন যাবে খবর দিয়া যাবে।

মা—তুমি খবর রাখবে।

মেয়ে—আমরা মেয়েরা বড় বাহির বাড়ীতে আসি না, কি করে খবর রাখব মা?

মা—ঠাকুরটি কাদের?

মেয়ে—আমাদের।

মা—তোমাদের ঠাকুর, আর বাহিরে এসে প্রত্যহ তাহার একটু আদর যত্ন কর না? তাকে বাইরে রেখে পর করে রাখবে?

মেয়েটি লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল—মা এবার থেকে তোমার কথা মনে রাখবো। "মমত্ব বুদ্ধিই সেবার প্রাণ"—মা বুঝাইয়া দিলেন ঐ মেয়েটিকে ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে।

মায়ের নিকটে আসিয়া এরূপ অঝোরে কাঁদেন তেমন আর দুইটি ভক্তকে দেখিয়াছি—একটি হলেন রাম ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রিত

শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র সেন, অন্যটি হলেন তৎকালীন M. A. G. Office-এর জ্যোতির্ম্ময় বাবুর স্ত্রী—মা যাকে নাম দিয়াছিলেন "রোয়িণী মা।" এই সঙ্গে আর দুই একটি দিল্লীবাসী ভক্তের কথা বলিয়া যাই, নতুবা হয়ত আর সুযোগ আসিবে না। একদিন হঠাৎ হুকুমজারি হইল, "মায়ের পায়ে হাত দিয়ে কেহ প্রণাম করিবেন না।" এই হুকুমজারি হওয়ার পরও যে ব্যক্তিটি মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেন তিনি হলেন আমাদের পঞ্চুদা। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল এই বালক পঞ্চুর নিকট। দিল্লীতে এখনও বাঁচিয়া আছেন রবীনবাবু। রেলে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। কাল্‌কাজি আশ্রম তৈরীর প্রারম্ভে Railway Co-operative Credit Society হইতে সুদে ধার নিয়া তিন শত টাকা দিয়াছিলেন। আর এক ভক্তকে দেখিয়াছি যিনি কাল্‌কাজি হইতে আট-নয় মাইল পথ হাঁটিয়া বাড়ী বাড়ী চার আনা, আট আনা চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। মায়ের আসার পূর্ব্বে আশ্রম বাটি নিজ হাতে ধুইয়া-মুছিয়া ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার করিতেন—মায়ের পায়খানাটি পর্য্যন্ত। কিন্তু মায়ের নিকট হইতে তিনি সর্ব্বদা দূরে দূরেই থাকিতেন। মা-ই নিজের গরজে তাকে ডাকাইয়া আনিতেন—এই ব্যক্তিটি আমাদের ধীরেনদা (স্বর্গীয় জীতেন দত্ত মহাশয়ের দাদা), এই ধীরেনদার সঙ্গে পাঁচকুইয়া রোড আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। অবশ্য সে দিন ছিল শিবরাত্রি। আমি ঐ রাতে যতবার জাগিয়াছি ধীরেনদাকে দেখিয়াছি জপ করিতেছেন।

মা নিজেই বলিয়াছেন তাঁহার লেখাপড়া গুরু মশাইর পাঠশালা পর্য্যন্ত, তাহাও একখানা ভাঙ্গা slate-এ যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু মা যখন যে কথাটি বলেন মনে হয় শাস্ত্র পুস্তক সামনে রাখিয়া বলিতেছেন, দাঁড়ি, কমাটিতেও ভুল নাই। মায়ের মুখে একটি গান শুনা যাইত, "গোপাল, গোপাল ব্রহ্ম গোপাল।" গোপাল তাপনীতে ঠিক এই ব্রহ্ম গোপাল কথাটিই আছে।

দিল্লীতে শ্রদ্ধেয় ডাঃ জে. কে. সেন মহাশয়ের বাড়ী একদিন দুইটি American ভদ্রলোক মায়ের সহিত দেখা করিতে আসেন। মা তখন ভিতরে ছিলেন। ভদ্রলোক দুইটি বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে আমাদের কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। মা বাহিরে আসিলে একটি সাহেব মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা prayer করার সময় ভগবানকে মনের ভাব নানা কথায় নিবেদন করি, তোমরা একই কথার পুনরাবৃত্তি কর কেন?" মা Allahabad-এর District & Sessions Judge শ্রীযুত নীরোজ নাথ মুখার্জী মহাশয়ের মাধ্যমে উত্তর দিলেন, "তোমরা যাহাকে 'একই কথা' বলিতেছ অর্থাৎ নাম —উহা একটি বীজ। শাখা-প্রশাখা সমন্বিত, পাতায় ঢাকা, ফলে ভরা বৃহৎ বটগাছ অবশ্য দেখিয়া থাকিবে—উহা একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে সম্ভব হইয়াছে—নাম সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বার্থক।" নাম সম্বন্ধে বটগাছের ঠিক এই উপমাটি যেদিন এক পুরাণের পাতায় দেখিতে পাইয়াছিলাম সেদিন মায়ের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িয়াছিল যাহা জীবনে সচরাচর হইয়া থাকে না।

মনোজদা হরিদ্বারে মাকে দেখিতে গিয়াছেন। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি মা—মা বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিয়া চলিলেন, দীর্ঘ প্রবাসের পর ছেলে যেমন বহু দিনের মা ডাকার অভাব একদিনে পূরণ করিয়া নিতে চায়। মায়ের নিকট পৌঁছিয়া তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তোমায় কত বার মা, মা করিয়া ডাকিলাম, তুমি একটিবারও সাড়া দিলেনা কেন?" মা তাহার সহজ হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বাবা তুমি যতবার মা, মা বলিয়া ডাকিয়াছ আমি ততবারই সাড়া দিয়াছি। তোমার receiver-টি out of order বলিয়া শুনিতে পাও নাই।" আমার সাথে পরিচয়ের হওয়ার দিন হইতে মনোজদাকে দেখিয়াছি একটি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ কিন্তু মা ব্যতীত অন্য কোন মূর্ত্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে সে ভয়ে তিনি দীক্ষাই গ্রহণ করিলেন না।

মনোজদার প্রকৃত পরিচয় দিতে গেলে ভাগবতের এই শ্লোকটিই আমার মনে পড়ে।

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

ভাঃ ১০।১৪।৮

মনোজদা সেই আমলের Labour Deptt.-এর Permanent Supdt. ছিলেন। একটি সামান্য কারণে (সে কারণটি ছিল তাহার Section-এর একটি Asstt.-এর শৈথিল্যে একটি file delay হইয়া যাওয়া) মনোজদাকে heavy penalty দিতে হয়। যেখানে তিনি Asstt. Secretary পদে Promoted হইবেন, তৎপরিবর্তে তিনি তথায় Asstt.-এর পদে Demoted হইয়া গেলেন। সে যে কত বড় একটা গ্লানি তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবেন না। মনোজদা বড় মেয়েটির বিয়ে দেওয়ার জন্য ছুটি নিয়া কলিকাতা আসেন। সুস্থ সবল মেয়েটি হঠাৎ গেল মারা। বিপাক তাহার এখানেও কাটিল না। অবশেষে নিজে Cancer রোগে আক্রান্ত হইলেন। এ সকল বিপদ আত্মকৃত কর্ম্মফল বলিয়া মাথায় পাতিয়া নিয়াই তিনি সর্ব্বোতভাবে মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া ছিলেন, তাহার মায়ের প্রতি প্রীতি কখন ক্ষীণ হয় নাই। এখন দেখা যাক্ যিনি ভক্তের শেষ ভরসা তিনি তদবস্থায় তাহার জন্য কি করিলেন। মনোজদা কলিকাতায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন, মা বলিলেন, "মনোজ বাবার আর কলিকাতা থাকার কোন আবশ্যকতা নাই, কাশীতে গঙ্গাতীরে নিয়া চল।" মনোজদার শরীরের তখন যে অবস্থা সে অবস্থায় কেহ তাহাকে কাশী নিয়া যাইতে সাহস পাইতেছিল না। অবশেষে শুধু মায়ের ইচ্ছাকে ভরসা করিয়া জিতেনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান দিলীপ মনোজদাকে

কাশী নিয়ে যায়। মা এই সময় প্রত্যহ মনোজদার খবর রাখিতেন। মনোজদার মেয়েরা মাকে বলিত, "মা! বাবাকে এখন এ কষ্ট হইতে অব্যাহতি দাও।" মনোজদা এই অবস্থাতেও অচঞ্চল ছিলেন। মা যখনই জিজ্ঞাসা করিতেন, "বাবা কেমন আছ?" মনোজদা উত্তর দিতেন, "তোমার কৃপায় ভাল আছি মা।" মনোজদার মেয়েরা এরূপ কথায় প্রত্যয় করিতে পারিতেছে না দেখিয়া মা মেয়েদের মনোজদার নিকট ডাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কেমন আছ। কোন কষ্ট বোধ হয়?" মনোজদা উত্তর দিলেন, "না মা ভালই আছি।"

মায়ের এইরূপ যে সকল গৃহী একান্ত ভক্তের সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি তাহাদের আর কাহারও কথা বলিতে গেলে আমি ডাঃ জে. কে. সেন মহাশয়ের কথাই অগ্রে বলিব। ডাক্তারবাবু ছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রশিষ্য, পূজনীয় অমৃতলাল সেন মহাশয়ের শিষ্য। ডাক্তারবাবুর ছোট ছেলেটি অজিত কুমার সেন (তখন B. Sc. পড়িতেছিল) যমুনায় স্নান করিতে গেল—আর ফিরিল না। আর একটি ছেলে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার সেন (তখন Cal. High Court-এর Judge ছিলেন) কলিকাতায় অসুস্থ, জীবন সংশয়, একজন ডাক্তার সর্ব্বদা নিকটে থাকা দরকার। ডাক্তারবাবু সে জন্য দিল্লী হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। এতদবস্থায় ডাক্তারবাবু সংবাদ পাইলেন মা দিল্লী যাইতেছেন। তখন মা দিল্লী গেলে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতেই থাকিতেন—ডাক্তারবাবুর বাড়ীতেই ছিল আশ্রম। ডাক্তারবাবুর অনুপস্থিতি হেতু মায়ের সেবার ত্রুটি হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি অমন রুগ্ন ছেলেকে ফেলিয়াই দিল্লী চলিয়া গেলেন। শিশিরবাবু আরোগ্য লাভ করিলেন এক অভাবনীয় উপায়ে। ডাক্তারবাবু যখন paralysis-এ আক্রান্ত হইয়া চলৎশক্তি রহিত, তখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা invalid chair-এ মায়ের নিকট বসিয়া থাকিতেন। এরূপ পুরুষ পুত্র কলত্র এমন কি আপন শরীরের বন্ধনেও বদ্ধ নহে বলিলে অত্যুক্তি

হয় না। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় "যমুনার জল উজান বহে কাহার বাঁশীর তানে।"

এই ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে আমরা মাকে যেমন পাইয়াছি তেমন পাওয়ার সুবিধা অন্য কোথাও হয় নাই। এখানে আমরা মাকে পাইয়াছি একটি ছোট মেয়ের মত, বকুল তলায় ফুলের ঘর, ফুলের কেয়াড়ি, ফুল মসারির মাঝে ১৯৪৮ খ্রীঃ এর মে মাসে জন্মতিথি উৎসবে। এখানে আমরা মাকে পাইয়াছি এক মহীয়সী নারীর মত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যে মহিমান্বিতা। এখানে আমরা মাকে পাইয়াছি কীর্ত্তন মাঝে ঊর্দ্ধবাহু নৃত্যরতা ভক্ত ভাবে। এখানেই তাহাকে দেখিয়াছি সমাধিমগ্না আবার অর্দ্ধবাহ্যের আলোছায়ার অবগুণ্ঠনে, এখানে আমরা মাকে কখন মৌনী দেখি নাই। দেখিয়াছি হাস্য কল্লোল উচ্ছসিতা এক নির্ঝরিণীর মত। সুতরাং এখানকার কথা আর একটু বলিতে ইচ্ছা হয়। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়াও কেন? মনটাকে control করিয়া এক জায়গায় থাকিতে পার না?" মা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "কে কাকে control করে! আমি কোথাও আসিও না, যাইও না—না কাহার খাই, না কাহার পরি।" ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর মুখ হইতে আর কোন বাক্য বাহির হইল না। অন্য একদিন (কোথায় ঠিক মনে নাই) মা বলিয়াছিলেন, "আমি নাই কোথায়?"

সত্য চিরকালই সত্য, সে প্রিয় বা অপ্রিয় যাহাই হোক না কেন। এই অপ্রিয়সত্য বাদ দিলে সত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, মায়ের কথা অপূর্ণ রহিয়া যায়। তাই মায়ের তেমন দুই একটি কথা লিখিতেছি উহা কাহারও নিকট আপাততঃ অপ্রিয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মা যে মঙ্গলময়ী।

New Delhi Gole Market-এর নিকট Baird Lane-এ হরিপদ দাস নামে এক Homœpathic Practitioner ছিলেন।

ভদ্রলোক যেমন অর্থোপার্জ্জন করিতেন তেমন সাধু সেবায় ও কীর্ত্তনাদি উৎসবে যথেষ্ট খরচ করিতেন। কিন্তু সংসারে তাঁহার একটা বড় অশান্তি ছিল। Paralysis-এ তাঁহার স্ত্রীর শরীরের নিম্নাংশ অসাড় হইয়া গিয়াছিল, ভদ্রমহিলার নড়িয়া বসার মতও ক্ষমতা ছিলনা। হরিপদবাবু একদিন তাঁহার স্ত্রীকে একখানা চটের উপর বসাইয়া তিন-চারজন লোকের সাহায্যে পাচকুইয়া রোডের আশ্রমে নিয়া আসেন এবং ঐ চট সমেত মায়ের সামনে বসাইয়া দেন। মা ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখা মাত্র এমন অবিরাম উচ্চৈস্বরে হাসিতে থাকেন যে হরিদাসবাবু বা তাঁহার স্ত্রী মাকে কোন কথা বলার সুযোগই পাইলেন না। তাঁহারা ব্যথিত হইয়া চলিয়া গেলেন। জানিনা মায়ের নিকট তাহারা ঐরূপ ব্যবহার পাইলেন কেন তবে অনুমান করা যায় ভদ্রমহিলা তাহার সুদূর অতীতের এমন একটি চিত্র নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মায়ের নিকট উহা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সুদূরের আর একটি ছবি নিয়া মায়ের নিকট আসিয়াছিল আর একটি মেয়ে—কাল কুচ্-কুচে। অবশ্য সে ঘটনা উক্ত ঘটনার অনেক পরে। ১৯৫০ খ্রীঃ-এ আগরপাড়া আশ্রমে। সে মেয়েটি আবদার করিয়াই মায়ের নিকট হইতে নিয়া গিয়াছিল একগাছা মুক্তার মালা। আবদার করার অধিকার তাহার ছিল—সে যে পূর্ব্বজন্মে মায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিল—মা যখন অষ্টগ্রামে ছিলেন। মেয়েটি তখন ছিল এক অচ্ছুৎ কন্যা। তাহার মালা পরার সাধ মিটাইতে হইয়াছিল অজয়গড়ের রাণী সাহেবার—ইনি রাজাসাহেব দুর্গা সিংজীর এক আত্মীয়া।

বাংলার মারামারি ও কাটাকাটি ও পরে Partition ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মা লোকক্ষয়ী ঐ রক্ত স্রোতের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। উহা শুনিয়া এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা ঐ রক্ত স্রোতের ভিতর আমাদের কাহাকেও দেখিলে কি?" মা এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছিলেন (সে উত্তরটি আমার মনে নাই)।

ডাঃ পান্নালালের জামাতা Mr. S. M. Srivastava (I.C.S.) এর বাড়ীতে ১৯৪৮ খ্রীঃ February মাসে মায়ের উপস্থিতিতে ভাগবত সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় ; তারপরে যথাক্রমে নাম যজ্ঞ ও ভাণ্ডারা। ইহার ভিতর মা একদিন স্বর্গীয় সুধীর কুমার সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন। মা তখন বলিয়াছিলেন, "দেখিলাম শ্রীবাস্তবের বাড়ীতে আগুন ধরিয়াছে, সুধীর বাবার বাড়ীতে আগুন ধরে ধরে।" ঐ কথার কিছুদিন পরেই Mr. Srivastava হঠাৎ মারা যান ও সে পরিবারে এক অস্বাভাবিক বিপর্য্যয় নামিয়া আসে, এবং একটি Stroke-এ সুধীরবাবুরও প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

মায়ের কথা বলিতে গিয়া বিপদ বিপদ বহু বিপদের কথা বলিলাম। কিন্তু সকল বিপদের বড় বিপদ ভগবৎ বিস্মৃতি। কিন্তু এই সর্ব্বব্যাপক বিপদের বিপক্ষে করুণাময়ী মা তাঁহার ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি জেহাদ ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন। উহা আপনারা আজ মঙ্গলদূত অভয়দার মুখে শুনিয়া রাখুন।

মা তখনও এক অন্যভাবে (অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থায়) আছেন। এই অবস্থাতেই মায়ের মুখ হইতে বাহির হইল, "সময় নষ্ট করোনা। আলস্য বড় খারাপ।" আবার একটু পরে বলিতেছেন, "এই শরীরটার কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই।"

অভয়দা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর যারা আসেনি ?" মায়ের মুখ হইতে বাহির হইল, "যারা মনে করছে তাদেরও।"

মায়ের এই কথাটি লিখিতে গিয়া আমার শ্রীধর স্বামীপাদের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, জীবেষ্বাবৃতং ব্রহ্মত্বং কৃষ্ণস্তু হৃষীকেশত্বাৎ অনাবৃত মতৌ ন তএ বুদ্ধ্যপেক্ষতি।"

—o—

(৭)

মিশর দেশের প্রধান সম্পদ তাহার নীল নদ। সে নদে বছরে একটিবার প্লাবন আসে। মিশরীয় কৃষকগণ ঐ প্লাবনের জল ধরিয়া রাখে সমস্ত বছরটির জন্য। কিন্তু শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর করুণাবারি বাঁধ দিয়া ধরার দরকার হয় না এবং উহা কাহারও সাধ্যাধীনও নয়; সে করুণা নদ, নদী, নালা বাহিয়া যে কোন উপায়ে যথাস্থানে, যথা সময়ে সমুদিত হয়। উহারই তুই একটি ছোট ঘটনা এখানে বিবৃত হইতেছে। ১৩৪৯ সনের (১৯৩৬ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসের মন্দির মাসিক পত্রিকায় সাধু দয়ালবাবা নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। উহার লেখক শ্রীক্ষেত্রনাথ সিংহ। সিংহ মহাশয় দয়ালবাবার একটি অতি ছোট life sketch দিয়াছেন। "দয়ালবাবা হুগলী জিলার এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারের উপর্যুপরি ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যথিত হইয়া তিনি যৌবনেই সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে বাবাজীর প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাঁহার দয়ার জন্যই তিনি উত্তর পশ্চিম ভারতে দয়ালবাবা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষ ৯০ বৎসর বয়সে সিমলা বাঙ্গালী কালীবাড়ীতে দেহরক্ষা করেন", ইত্যাদি। এতদ্দৃষ্টে মনে হয় দয়ালবাবা মৃত্যু সময়ে মায়ের যে করুণা ধারায় স্নাত হইয়াছিলেন উহা সিংহ মহাশয়ের অবিদিত। অপরপক্ষে যাহারা দয়ালবাবার উপর মায়ের করুণাবারি বর্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা দয়ালবাবার পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে অজ্ঞাত। ইহাদের যোগসূত্র স্থাপন করিলে আশাকরি back ground সমন্বিত মায়ের একটি করুণাউজ্জ্বল আলেখ্য ফুটিয়া উঠিবে। দয়ালবাবার জীবনের শেষ অংশ বন্ধুবর জিতেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অন্যান্য বন্ধুদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি :—

Simla কালীবাড়ীতে দয়ালবাবা ৪ঠা জুন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। সেবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব হয় Kishanpur আশ্রমে। তাহার পর মা Solan আসেন। Solan থেকে শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে Simla কালীবাড়ী Guest house-এ তাঁহার সঙ্গীয় ৫।৬ জন লোকের থাকার ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা? তখন কালীবাড়ী management committee-র secretary ছিলেন স্বর্গীয় সুধীর কুমার সেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই শ্রীশ্রীমায়ের অসামান্য গুণাবলীর কথা কিছু কিছু শুনিয়া মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সুধীরবাবু মাকে সংবাদ পাঠান যে কালীবাড়ীতে স্থানের অভাব হইবে না। এই সংবাদটি অসুস্থ দয়ালবাবার কানে পৌছায় এবং তখন হইতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লালসায় তিনি উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া উঠেন। দয়ালবাবা দেহরক্ষা করেন বেলা ৪ টার সময়। ঐদিন সকাল হইতেই তিনি বারবার শ্রীশ্রীমায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। সে কি এক আকুল প্রতীক্ষা। অপরদিকে দেখা দিল এক অধীর আগ্রহ। শ্রীশ্রীমা তাঁহার সঙ্গী-দিগকে তাড়াতাড়ি রওয়না হওয়ার জন্য বার বার তাড়া দিতে থাকেন। তৎসত্ত্বেও তাহাদের রওয়না হইতে প্রায় পৌনে দুইটা বাজিয়া গেল। এই বিলম্বের খেসারৎ স্বরূপ শ্রীশ্রীমা Cart Road Gordon Castle-এর নীচে নামিয়া স্বয়ংই একটি Rickshaw নিয়া অজানা অচেনা কালীবাড়ী পৌছিয়াই সোজা দয়ালবাবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন—কোন পথ প্রদর্শকের অপেক্ষা না রাখিয়া। শ্রীশ্রীমা যেমন দয়ালবাবার ঘরের দরজায় আসিয়া দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইলেন দয়ালবাবা তখনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগের ৫ মিনিট আগেও তিনি শ্রীশ্রীমা কখন আসবেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পথের ধূলায় তিনি দৃষ্টিশক্তিটি কখনও হারান নাই, বলাবাহুল্য খেয়াঘাটে খেয়াখানিও তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল। যাহা হউক দয়ালবাবার দেহত্যাগের কথা

শুনিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই পয়ার কয়টি আমার মনকে ভরিয়া দিয়াছিল।

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলে বার বার।
প্রভু-মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ॥

মায়ের কৃপার আর একটি ঘটনা। দক্ষিণ কলিকাতা নিরাময় ভবনে যাঁহারা রবিবারের আসরে যোগদান করিতেন তাঁহারা অনেকেই শ্রীযুক্ত তরুণ ঠাকুর মহাশয়কে জানেন। তরুণবাবুর মাতৃদেবী একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, কোথাও একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছেন। অদূরে দেখা গেল একটা সুন্দর মন্দির। তত্রত্য লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সেটি মা আনন্দময়ীর মন্দির—মন্দিরের ভিতরে দেখিলেন এক দেবীমূর্ত্তি। তখন ঘুম গেল ভাঙ্গিয়া। তরুণবাবুর মা ইতিপূর্বে কখনও মা আনন্দময়ীর নাম শুনেন নাই—মনে করিলেন মা আনন্দময়ী হয়ত দুর্গা মায়ের অপর একটি নাম। এ বিষয়ে অধিক জানার জন্য তিনি আর কোন চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু চক্রীর চাকা কখনও বেতালে চলে না। কিছুদিন পরে তরুণবাবুর এক আত্মীয়া লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতা তরুণবাবুদের বাড়ীতে আসিলেন। এ ভদ্র মহিলার সাধুসন্তের নিকট যাতায়াত করার অভ্যাস ছিল ও আছে। তরুণবাবুর মা কৌতূহল বশতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে মেয়ে, তুমি ত' অনেক সাধুসন্তের নিকট যাওয়া-আসা কর—আনন্দময়ী নামে কোন সাধুমায়ের খোঁজ রাখ কি?" মানুষের জীবনতরী বোধহয় এমনি করিয়াই ঠিক ঘাটে গিয়া পৌঁছায়।

এ ভদ্রমহিলা ছিলেন মায়ের অনুগৃহীত জন, সুতরাং তিনি মায়ের যতটুকু জানেন সকলটুকু এক নিঃশ্বাসে পঞ্চমুখে প্রকাশ করিতে আর কোন দ্বিধা করিলেন না। যাত্রার সুদীর্ঘ পথ আয়ত্তের অধীনে আসিয়া গেল। মা কয়েক দিনের মধ্যে Ekdalia Road-এর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তরুণবাবুর মায়ের নিকট যখন সে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল তিনি তখন অসুস্থ তাই নিজে উক্ত আশ্রমে না গিয়া পাঠাইলেন পুত্র ও পুত্রবধূকে—তাহারা দেখিয়া আসিবে তাহার স্বপ্নদৃষ্ট আনন্দময়ী ও একডালিয়া রোড-এর আনন্দময়ীর ভিতর সাদৃশ্য আছে কিনা। মায়ের কার্য্য বোঝা দুষ্কর—তিনি বোধ হয় চাহিয়া ছিলেন ঝাড়ে মূলে আত্মসাৎ করিবেন। তাই তরুণবাবু ও তাহার স্ত্রী সেই যে মাকে দেখিলেন হৃদয়ের গভীরে পড়িয়া গেল ছাপ—ভাঁজ করা কাপড়ে একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়িলে যেমন হয়। তাহারা বাড়ী আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের যে ডেসক্রিপশান দিলেন (বিশেষতঃ চূড়া বাঁধা চুলের) উহাতে দুইটি মা একটি মায়ে মিলাইয়া গেল—সে পরিবারে দেখা দিল মহানন্দং।

New Delhi Panchquia Road-এর আশ্রমে আমাদের দুইটি মেজদি ছিলেন—একটি ঢাকার শচীবাবুর বোন অপরটি বরিশাল জিলার বেড়মহল গ্রামের, নাম বোধহয় বিরাজ মোহিণী। দ্বিতীয় মেজদিটি একদিন ঢাকার রাস্তায় এই অজানা-অচেনা মাকে প্রথম দর্শনেই স্থির নিশ্চয় হইয়াছিলেন ইনি আমার জীবন মরণের বান্ধব, তাই না উপনিষদ গাহিয়াছেন—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্॥

(কঠোপনিষদ্)

তৃতীয় ঘটনা অনেক দিনের কথা। মায়ের উপস্থিতিতে কোথাও কীর্ত্তন হইতেছিল। একটি মুসলমান যুবক সেই পথে যাইতে যাইতে মাকে দেখিয়া কি এক আকর্ষণে ঢুকিয়া পড়িল কীর্ত্তন আসরে

সকলের অলক্ষ্যে। যু কটি চুপ করিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ কি যেন এক তড়িৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল তাহার দেহ ও মনে। কীর্ত্তন সঙ্গীতে সে আল্লা, আল্লা বলিয়া নাচিতে লাগিল, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া। দেখা দিল সে অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার, ভাসিয়া গেল তাহার চির আচরিত সমাজের বিধি। সকলেই অবাক্। তবে কেহ হয়ত' তাহার মুখে হরিনাম শুনিলে অধিক প্রীত হইতেন কিন্তু মায়ের নিকট আল্লা ও হরি একই বস্তু। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিতেন, "প্রকৃত সাধু কখনও কাহাকে দলে টানেন না।" যে মায়ের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে সে মা চান তাঁহার সকল সন্তান-গুলিকে স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে। এই সম্পর্কে মির্জাপুরের ডাক্তার উপেনবাবুর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। উপেনবাবু ছিলেন ঋষি অরবিন্দের follower। তিনি একদিন মাকে বলিলেন, "মা পণ্ডিচেরিতে না গিয়া তোমার নিকট থাকিয়া সাধন ভজন করিতে ইচ্ছা হয়।" মা বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে মায়ের কর্ত্তব্য তাকে স্বামীর ঘরে পাঠান—সেটি তোমার সাধন ক্ষেত্র।"

এবার জিতেনবাবুর দাদা আমাদের ধীরেনদার Diary হইতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। ১৯৫৫ খ্রীঃ ৯ই জুলাই। (লেখক সেদিন সেথায় উপস্থিত ছিল)। Lodi Road-এর এক অল্পবয়স্কা ভদ্রমহিলা বছর পাঁচেকের একটি কন্যাসহ এই প্রথম Kalkajee আশ্রমে মাতৃদর্শনে আসিয়াছিলেন। ঐ ভদ্রমহিলার অনবধানত বশতঃ তাহার মেয়েটি অন্য একটি ৭।৮ বৎসরের মেয়ের সাথে ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে আশ্রমের অনতিদূরে Charitable Eye Hospital সংলগ্ন পুকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। এ পুকুরে সাধারণতঃ অল্প জল থাকে ও গরু মহিষাদি ঐ জল পান করিয়া থাকে। কয়েকদিন পূর্ব্বে বর্ষা হওয়ায় পুকুরটি সেদিন বেশ জলপূর্ণ ছিল। বালসুলভ চপলতা বশতঃ দুইটি মেয়েই পুকুরের sloping-এ নামিয়া পড়িতে উভয়ের পা পাঁকে ডুবিয়া যায়। পাঁক

হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টার ফলে ছোট মেয়েটি জলে গড়াইয়া পড়ে ও ডুবিয়া যায়। অন্য মেয়েটি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এদিকে শ্রীশ্রীমা তাঁহার শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন ; অকস্মাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ব্রহ্মচারিণী উদাসকে বলিয়া উঠিলেন, "জল জল।" উদাস বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "জল আনব?" মা আপন মনে বলিয়া চলিলেন, "জল, জল দেখতে পাচ্ছিস্ না।" উদাস অধিকতর বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "জল কোথায়?" মা পূর্ব্ববৎ বলিয়া চলিলেন, "ঐ ত' একেবারে জলময়।" তারপরে মা একেবারে নীরব। উদাস চাহিয়া রহিল মায়ের নিমেষহারা নয়নপানে—নিমেষে ঘটিয়া গেল অনেক। মা তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে না আসিতে মেয়ে দুইটি ভিজা ও কাদা-মাখা অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। ছোট মেয়েটির মা মেয়ের অবস্থা দেখিয়া প্রথমেই গালাগালি সুরু করিয়া দিল। কিন্তু মায়ের প্রাণ ; পরক্ষ'ণে মেয়েকে কোলে নিয়া আদর করিতে প্রকাশ পাইল সে পুকুরের জলে পড়িয়া গিয়াছিল। তখন এক বুড়ি আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। মা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সে বুড়ি কোথায় রে?" মেয়ে মায়ের ঘরের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলিল, "সে বুড়ি ঐ ঘরের ভিতর বসিয়া আছে এবং প্রাতে ঐ বুড়িই আমার গলায় মালা পড়াইয়া দিয়াছিল।" বস্তুতঃ ঐ মেয়েটি তাহার মায়ের সাথে আসিয়া যখন মাকে প্রণাম করিয়াছিল মা তাহার গলায় একগাছি মালা পড়াইয়া দিয়াছিলেন। সে মালার পরশ তাহার বুকে তখনও জাগিয়াছিল। হয়ত সে পরশটি তাহার জীবন মরণের কাঠি।

আর এক ঘটনার কথা লিখিয়া আজ প্রবন্ধটি এখানে শেষ করিতেছি। অবশ্য ঘটনাটি মায়ের করুণা সম্পর্কিত নয়। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, "তবে এখানে উহা লিখিতেছেন কেন?" তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, "সাজান বাগানে আছে ফুলের সৌন্দর্য্য ও তাহার সহিত মালির রুচি কিন্তু মালির রুচির অপেক্ষা

না করিয়াই এখানে সেখানে ফুল ফোটে ও আপনি সৌন্দর্য্যে মধুকরকে আকৃষ্ট করে।"

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৃন্দাবনে নিম্বার্কাশ্রমে সন্তদাস বাবাজীর স্থাপিত যুগল বিগ্রহটি আশ্রম committee-র দুই পক্ষের রেষারেষিতে অগ্নিদগ্ধ হইয়া যান। সে রাতে মা উড়িয়া বাবার আশ্রমে ছিলেন। সঙ্গে ছিল ব্রহ্মচারিণী উদাসজী। মা সেখানে থাকিয়া মানুষ দেহ পোড়ার গন্ধ পান ও মা যে ঘরটিতে ছিলেন সে ঘরটি যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া যায়। যুগল বিগ্রহ যে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় আসিয়া মাকে দেখা দেন ও নিম্বার্কাশ্রমের দিকে ইঙ্গিত করেন—সে ছিল কি এক করুণ দৃশ্য। পরমুহূর্ত্তে সে বিগ্রহ আপন ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যে মায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। Frame-এ বাঁধান ছবির ভিতর হইতে ঠাকুর দেবতা নামিয়া আসিয়া মায়ের সাথে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ান। শুনিয়াছি বৃন্দাবন আশ্রমের পিছনেও তেমন একটা ইতিহাস আছে; শুনিয়াছি মায়ের একটি গান, "কৃষ্ণ কানাইয়া বেণু বাজাইয়া যায় রে," উহাও দৃষ্ট—মায়ের নিকট জড় ও চেতন বলিয়া দুইটি বস্তু নাই—সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম।

—o—

(৮)

আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, গত ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যে, মা আনন্দময়ী কলিকাতায় এলেন মাকে কিরূপ দেখলেন? আমি তাহার উত্তরে বলিতে বাধ্য হইব যে মাকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি মা যেন এক নূতন সন্তানের জননী। নূতন মায়ের প্রথম সন্তানদের প্রতি সমধিক স্নেহ ভালবাসা থাকিলেও গৃহের গুরুজনদের নিকট সে স্নেহ ভালবাসা ব্যক্ত করিতে কেমন যেন একটু লজ্জা

লজ্জা বোধ করেন, সন্তানকে শাশুড়ী-ননদের কোলে দিয়া দূর হইতে তাহার উপর দৃষ্টি রাখেন—একটি বাচ্চা আছাড় খাইলে গোপনে অশ্রু বর্ষণ করেন, পরন্তু উচ্চৈঃস্বরে আহা আহা বলিতে পারেন না। কিন্তু পরিণত বয়সের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মায়ের সেরূপ ব্যবহার খাটে না। মা ও সন্তান উভয়ে সেয়ানা হইয়া যায়।

আমার ছোট ভাগিনেয় বধূ নীহার গুহঠাকুরতা বার্মায় জন্মিয়াছে —সেখানেই তাহার শিক্ষা দীক্ষা। বলিতে গেলে বাংলার মাটিতে সে পা দিয়াছে এই সেদিন। মাকে তাহার দেখা দূরের কথা ইতিপূর্ব্বে সে মায়ের নামও কখন শুনে নাই। আমি তাহাকে আমার লেখা, "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" চারিটি প্রবন্ধ পড়িতে দিয়াছিলাম। প্রবন্ধ কয়টি পড়িয়া সে আমাকে বলিল, "মামা, মা কলিকাতায় আসিলে আমাকে একবার দেখাবেন।" আমি বলিলাম, "মা! আমাকে দেখায় কে? আমি আবার তোমাকে দেখাব। তবে মা কলিকাতা আসিলে তোমাকে আমি সে সংবাদটি পৌঁছাইব—তারপরে তোমার ভাগ্য বা মায়ের কৃপা।" মা ১২ই মার্চ বৈকাল ৪।৫ টা পর্য্যন্ত নিরাময় ভবনে আসিতে পারেন জানিয়া ঐ দিনই তুপুর বেলা ভাগিনেয় এর বাড়ী গিয়া সে সংবাদটি পৌঁছাইলাম। তখন ভাগিনেয় বধূ বাসায় ছিল না। সুতরাং পরদিন ১৩ই মার্চ ছেলেমেয়ে তুটিকে স্কুলে পাঠাইয়া ও গৃহের অন্যান্য কাজ শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার দৈনন্দিন কাজে বাহির হইতে হইল—ইচ্ছা রহিল পথে নামিয়া মাকে একটিবার দেখিয়া যাইবে নতুবা অন্য সময় আসা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও সে সময়মত নিরাময় ভবনে পৌঁছাইতে পারিল না। নিরাময় ভবনে পৌঁছাইয়া সে শুনিতে পাইল, "মা এতক্ষণ বাহিরে বসা ছিলেন—একটু পূর্ব্বেই ভিতরে চলিয়া গেলেন—প্রোগ্রাম মত বাহির হইলে সে রাত আট্‌টা।" মাকে আর দেখা হইল না— এই কথা ভাবিতে তাহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া পড়িল। সে

মনের ব্যথা, প্রাণের টান মাকে পৌঁছাইতে বিলম্ব হইল না। আর্তের চোখের জল শুকাইতে না শুকাইতে মা আবার বাহিরে ফিরিয়া আসিলেন। আমার ভাগিনেয় বধূ ছিল প্রথম সারিতে সুতরাং মাকে দেখিতে সে কোন বাধা প্রাপ্ত হইল না—ভাল করিয়াই দেখিল। তবে সাধ মিটাইয়া দেখিয়াছি—মায়ের সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কেহই উহা বলিতে পারে নাই। নিরাশার ধন হাতে পাইয়া তাহার যে আনন্দ হইয়াছিল উহা ব্যক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস না করাই আমি সমীচীন মনে করি। ওদিকে পিছনের লোক সকল হুরমুর করিয়া মায়ের নিকট আসিয়া পড়িল। মায়ের তত্ত্বাবধায়ক এক ব্যক্তি একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আপনারা মাকে এইরূপ জ্বালাতন করেন বলিয়াইত মাকে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না।" একজন দর্শনার্থী অমনই বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে-মেয়েরা মাকে জ্বালাতন করবে না'ত কাকে জ্বালাতন করবে?" মা এ কথাটি আবৃত্তি করিলেন, "ছেলে-মেয়েরা মাকে জ্বালাতন করবে না'ত জ্বালাতন করবে কাকে?" —এ কথা বলিতে বলিতে মায়ের চোখ দুইটি হইয়া উঠিল সজল। একটি সুন্দর ও স্পষ্ট অঙ্গীকার, এমন অঙ্গীকার পুরাতন-অভিমানী ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে অত্যন্ত কমই জুটিয়াছে। (সাধক মনে রাখিবেন, অভিমান মাত্রই ভগবান প্রাপ্তির বাধক—ভগবান রাধারাণীকেও বাদ দেন না)।

আর একটি কথা বলিয়াছেন শশধর দাদার স্ত্রী অরুণা দিদি। কত লোক দূর দূর হইতে কলিকাতার ট্রামে-বাসে ঝুলিতে-ঝুলিতে মাকে দেখিতে আসিয়াছে—তাহাদের কাহারও কাহারও কোলে ছেলে-মেয়েও ছিল। কেহ মায়ের নাম করিয়া একগাছি মালা নিয়া আসিয়াছে। হাতের মালাখানি পিষ্ট হইতে না দিয়া নিজেই পিষ্ট হইয়াছে তাহাতেও তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। জানিয়া রাখুন মায়ের দৃষ্টি হইতে ইহাদের কেহ বাদ পড়েন নাই। তাহাদের ধৈর্য্য ও চেষ্টা দেখিয়া মা বলিয়াছেন, "আহা এরা ভগবানকে কত ভালবাসে এবং

ভগবানকে ভালবাসে বলিয়াই ত' এ দেহটার কাছে কত কষ্ট করিয়া আসে।" আমি মোটামোটি কথাটি বলিলাম। মায়ের ঐ কথাটির ভিতর কি হেয়ালি বা গুপ্ত ইঙ্গিত থাকিতে পারে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার ন্যস্ত রহিল মায়ের ভক্তদের উপর।

তারপর তরুণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি দুইটি ঘটনার কথা। (১) এক ভদ্রলোক মায়ের নিকট গিয়া একটি প্রণাম করিবেন ও মাকে ভাল করিয়া দর্শন করিবেন এই আশায় এ দরজায় ও দরজায় বহু সময় ঘোরাঘুরি করিয়াও চক্রব্যুহ প্রবেশ পথের সন্ধান পাইলেন না। প্রতীক্ষা সাধনের একটি বিশেষ অঙ্গ। ভদ্রলোক নিরুৎসাহ না হইয়া মায়ের ঘরে উঠিয়া যাইবার সিঁড়ির গোড়ায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। তখন রাত নয়টা বাজিয়াছে। অন্তরের মাঝে শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছেন, "ওরে এবার উপরে চলে আয়—এখন তোকে বাঁধা দিবার মত সিঁড়িতে কেহ নাই," কথাগুলি এত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল যে ভদ্রলোক উহা অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ দেখিলেন না। চলিয়া গেলেন মায়ের কাছে। "বিশ্বাসে মিলায় ধন তর্কে বহুদূর" এ কথাটি তাহার জীবনে লব্ধ সত্য (স্বল্পমপ্যস্য ত্রায়তো মহতো ভয়াৎ)।

(২) অন্য এক ভদ্রলোক (নবীন উকিল বয়স্ক হইলে বোধহয় হইত না) যোধপুর পার্ক হইতে আসিতেছিলেন গড়িয়াহাটা অভিমুখে। বাসে থাকিয়া দেখিলেন রেলওয়ে ওভার ব্রীজের উপর বহু লোক দাঁড়াইয়া আছেন—মা সে পথে যাবেন এই আশায়। ভদ্রলোক ইতিপূর্ব্বে মায়ের কথা শুনিয়াছেন দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার কখনও হয় নাই। আজ দেখিবার জন্য প্রাণে একটা টান বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি পুলের গোড়ার স্টপে নামিয়া চোখ যেদিকে যায় চলিতে চলিতে মায়ের ঘরে, মায়ের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। বহু বাধা থাকার সম্ভাবনা থাকিতেও কোথাও বাধা প্রাপ্ত হইলেন না। মায়ের মুখের কথা হাতের কিছু মিষ্টি ও

একটি ফুল নিয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন। এ সকল খুব বিস্ময়ের বিষয় নয়। সূর্য্য অস্তোন্মুখ হইলে গৃহপালিত গবাদি গোচারণ ভূমি হইতে আপনা-আপনি গৃহে ফিরিয়া আসে। সংসার-ক্ষয়োন্মুখ মানুষ ত' দূর হইতে জন্ম-জন্মের বান্ধবের অঙ্গ গন্ধ পায়; দেখিতে পায় তাঁহার পদচিহ্ন—পথের বাঁধাই তাহাকে পথ দেখাইয়া নিয়া চলে।

ডাকিয়া লওয়ার দুইটি নূতন কথা লিখিতে লিখিতে পুরাতন ডাকিয়া দেওয়ার একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, উহাও লিখিতেছি, কেন না যদি আবার ভুলিয়া যাই বা লেখার সুযোগ যদি আর না আসে। মা তখন দিল্লী বাবর রোড আশ্রমে ছিলেন, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ ঘোষ (স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য) আশ্রমে মাকে দেখিতে গেলেন। মা তখন তাঁহার ঘরে একাই ছিলেন, দাদা মায়ের ঘরে ঢুকিয়া গেলেন, মায়ের দু'খানি অনাবৃত পা তাহার নজরে পড়িয়া গেল—মায়ের পা ছুঁইয়া একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিলেন। এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া উহা দেখিতে পাইয়া একটি অসস্তি সূচক বাক্যে দাদাকে বলিলেন, "আপনি মায়ের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলেন," দাদা উত্তর দিলেন, "সাধু গুরুকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতে হয় আমি ছোট বেলা হইতে এই শিক্ষাই পাইয়া আসিয়াছি।" ইতিমধ্যে আশ্রমের আর দুই এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহারা ও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মত পোষণ করিতে লাগিলেন। দাদা একটু ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন, "তা'হলে উচিত ছিল মায়ের পা দু'খানি আগলাইয়া এখানে আপনাদের বসিয়া থাকা অথবা কাগজে লিখিয়া দরজায় টানাইয়া দিতে পারিতেন।" মা কিন্তু আর কাহাকেও কিছু বলিতে দিলেন না। মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি দিয়াছি।" একটি কথায় সকল ঠাণ্ডা—শুধু ঠাণ্ডা বলিলে ভুল হয়—দাদার নয়ন হইতে বারিপাত হইয়াছিল—করুণাময়ীর করুণায়।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ভোলানাথ তাহাদের একটি ছাউনিতে দাদার থাকার স্থান করিয়া দিয়াছিলেন—সে অনেক কথা। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, "পসরা নিয়া আসিয়াছি গ্রাহক পাই ভাল, না পাই মাথায় করিয়া বহিয়া নিয়া যাইব না, বিলাইয়া দিয়া যাইব।"

যাইহোক এখন আপনারা বলুন—যাহারা বলিয়া থাকেন আমাকে মায়ের ঘরে ঢুকিতে দিল না, বা নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না, তাহাদের এরূপ অভিযোগ করার কারণ থাকিলেও সে কারণ কতখানি ন্যায়-সঙ্গত।

১৩ই মার্চ দুপুর বেলা এক ভদ্রমহিলা (পরিচয় তিনি মায়ের ভক্ত) আমাকে বলিলেন, "মাকে দেখে শিবেনদার মুখে আজ হাসি ফুটেছে।" আমি ভগিনীটির মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলাম—সে হাসিটি আমার না তাঁহার অন্তরের। তারপরই মনে মনে তাঁহাকে জানাইলাম আমার একটি প্রণাম। শশধর দাদার স্ত্রী বলিয়াছেন, "হলঘরের ভিতর যে সকল মেয়েরা মায়ের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন তাঁহাদের সবাইর মুখে ছিল এক কথা—মাকে কে কবে দেখিয়াছেন, মায়ের কি দয়া কে কি ভাবে পাইয়াছেন—ইত্যাদি—অর্থাৎ যে যতটুকু মাকে পাইয়াছে তাহা তাহার জীবনের একটি গর্ব্বের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আমার এক বন্ধু শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, "একদিন দেখিলাম মুক্তারাম বাবুর ষ্টীট ধরিয়া কাতারে কাতারে লোক যাইতেছে। বিষয়টি কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মা আনন্দময়ী এখানে কোথাও আসিয়াছেন।" লাভহীন বাণিজ্যে কেহ আত্মনিয়োগ করে না।

তারপর জানাইতেছি মায়ের আর একটি অঙ্গীকারের কথা—

এবার মা আনন্দময়ী যে তিনটি দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন সে জন্য তাহার ভক্তদের যে ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইয়াছিল সে ব্রতকে আমি বোধন বলিয়াই অভিহিত করিব।

তবে এই বোধনের স্থায়িত্ব ছিল ১০টি মাস—অর্থাৎ ১৩৭৯ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫-৫-৭২) হইতে এ সালের ২৬শে চৈত্র পর্য্যন্ত (১০-৩-৭৩)।

কয়েকবছর ধরিয়া ভগিনী ছবি ব্যানার্জীর বাড়ীতে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নামযজ্ঞ হইয়া আসিতেছিল। এ যজ্ঞের হোতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও একটি পারিবারিক কারণবশতঃ ১৩৭৯ সনের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ১লা জ্যৈষ্ঠ সে যজ্ঞটি অনুষ্ঠিত হয় নিরাময় ভবনে। এই স্বার্থক নামা ভবনটি ধন্য এবং ধন্য হইল সেই পুরুষটি যাহার উদ্যোগে সে যজ্ঞ তথায় উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। যাহাহোক ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মায়ের কলিকাতা আগমনের একটি কথা চলিতেছিল কিন্তু সকলই ছিল অনিশ্চিত। কলিকাতার ভক্তরা এই অনিশ্চিতকে একটি নিশ্চিত রূপ দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

সাধনা প্রথম, সিদ্ধি পরে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল নিরাময় ভবনে যে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল সে নামযজ্ঞের আগুন নিভিতে দেওয়া হইবে না। তাই ঐ যজ্ঞের পর প্রতি রবিবার ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শান্ত পরিবেশে একটি ঘরে চলিতে লাগিল নিরবচ্ছিন্ন জপ এবং অন্য একটি ঘরে মাসের শেষ রবিবার বাদে অন্য কয়টি রবিবার প্রথমে সমবেত গীতা পাঠ ও পরে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি রাত ৮টা পর্য্যন্ত—স্বতন্ত্রকে পরতন্ত্র করার একটি দীন প্রচেষ্টা। নির্দিষ্ট রহিল মা আসিলে তিনি ঐ জপযজ্ঞের পবিত্র ঘরখানিতে থাকিবেন। ঐ অনুষ্ঠানের পাঠ ও কীর্ত্তনে আমারও ২।৪ দিন যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছিল—ব্রতী হিসাবে নয় পোষাকী দর্শক হিসাবে।

মা নিরাময় ভবনে আসিয়া ঐ ঘরটিতেই ছিলেন। কিন্তু এবার কলিকাতায় আসিয়া মায়ের এত ঘোরাঘুরি করিতে হইয়াছিল যে তাঁহাকে নিরাময় ভবনে পাওয়া অনেকের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল—এমন কি তাঁহাদেরও যাঁহাদের জপ ও ধ্যান যাহাকিছু

মাকে নিয়াই। তাই এক ভক্ত মাকে বলিলেন, "মা! যাহারা তোমাকে তাহাদের ভিতর নিবিড়ভাবে পাইবার আশায় এখানে বৎসরাবধি সাধন-ভজন করিল তাহারা তোমার মুখের দুইটি কথা পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল না—তাহাদিগকে আমরা কি বলিব।" মা বোধহয় বাহিরে যাইতেছিলেন—বলিলেন, "তাহাদিগকে জপের ঘরে একত্রিত হইয়া বসিয়া থাকিতে বল—যে অবধি ফিরিয়া না আসি।" রাত ১১টার পর মা তাহাদের সাথে মিলিত হইলেন ও বলিলেন, "যাহারা এ অনুষ্ঠানে ব্রতী ছিলে তাহাদের দরজা খোলা রহিয়া গেল।" এ কথাটি কে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন জানিনা (সাধনের পর্য্যায় থাকিলে গ্রহণযোগ্যতার ও পর্য্যায় আছে) তবে একথা নিশ্চিত যে সাধকের অনন্ত জীবনযাত্রার পথে একটী বিশ্রামের স্থান প্রস্তুত হইয়া রহিল—খোলা দরজায় মা হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন এটি তাহার প্রতিজ্ঞাবাক্য? ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

—o—

(৯)

যতই বলুন না কেন অনেকদিন প'রে মায়ের একটি দর্শন পাইয়াও তাঁহার নিকট একটু বসিতে না পারিলে, এবং "বাবা, কেমন আছ," মায়ের মুখে এই স্নেহমাখা ছোট কথাটি শুনিতে না পাইলে মনে হয় সে দেখাটা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। মনের ভিতর জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে কি যেন এক অপরাধ করিয়াছি, যাহার ফলে মা আজ আমার সাথে কথা বলিলেন না। ১৯৭৩ সনের ১১ই মার্চ রাতের বেলায় দক্ষিণ কলিকাতার "নিরাময় ভবনে" মাকে অনেকদিন পরে দেখিতে পাইলাম ইহা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। কিন্তু সে দেখা অনেকদূর হইতে—কয়েকশত লোকের পেছনে বসিয়া, কয়েকটা পিলারের এ-পাশ ও-পাশ করিয়া, কোন প্রকারে ঘন

মেঘের আড়ালের রোদের মত—আঁধার ঘুচিলেও জ্যোতি ম্লান। তাহাতে আবার আর একটি প্রতিবন্ধক ছিল—সেটি হইল মায়ের চোখের কাল চশমা জোড়া। মাকে দেখিলাম অথচ তাঁহার চোখে আমার চোখ মিলিল না—এ দেখায় অনন্তঃ আমার মন ভরিল না। তৎপর দিবস ১২ই মার্চ যে আবার মাকে দেখিলাম সে দেখাও তদ্রূপ—আমার দৃষ্টির পরিধির এক রকম বাহিরে। তারপর মা ছিলেন নির্ব্বাক, ভজন গান শুনাইলেন স্বনামধন্যা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী। দর্শকদের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, "আমরা শুভলক্ষ্মীর গান শুনিতে আসি নাই, মায়ের মুখের কথা শুনিতে চাই।" বলিতে কি আমিও সে গানে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। তবে একটু আনন্দ হইল মায়ের সংগ্রহের পরিপাটী দেখিয়া ও মায়ের এক সুদূর প্রসারী আকর্ষণী শক্তি স্মরণ করিয়া। এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া একটু ভাল করিয়া দেখিবার ব্যর্থ চেষ্টা নিয়া ঘরমুখী হইতে বাধ্য হইলাম, কেননা লোকের চাপ সামলানো ক্রমেই আমার শক্তির বাহিরে যাইতেছিল। মায়ের দর্শন কতকটা অদর্শনের সামিল রহিয়া গেল।

এখন কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন—মাকে কিরূপ দেখিলে, আপনার মন ভরে? আমি সে প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিব না, কেননা সে বিষটি নির্ভর করে দাতার দানের উপর, প্রার্থীর অভিপ্রায়ের উপর নয়। তবে আমার মাকে কিরূপ দেখিবার ইচ্ছা হয় এরূপ প্রশ্ন উঠিলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—

ক্ষণং ক্ষীণঃ পীনঃ ক্ষণমহহ সাশ্রু ক্ষণমথ
ক্ষণং স্মের শীতঃ ক্ষণমনল তপ্ত ক্ষণমপি।
ক্ষণং ধাবন্ স্তব্ধঃ ক্ষণমধিক জল্পন্ ক্ষণমহো
ক্ষণং মূকো গৌর স্ফুরতু মম দেহো ভগবতঃ॥

ক্ষণে কৃশ, ক্ষণে স্থূল, ক্ষণে সাশ্রুলোচন, ক্ষণে স্মিত বদন, ক্ষণে শীতল, ক্ষণে অনল-তপ্ত, ক্ষণে ধাবমান, ক্ষণে স্তম্ভিত, ক্ষণে প্রজল্পকারী

এবং ক্ষণে মৌনী এতাদৃশ ভগবান গৌর কলেরব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন।

ক্ষণং হসতি, রোদিতি ক্ষণমথ ক্ষণং মূর্চ্ছতি
ক্ষণং লুঠতি ধাবতি ক্ষণমথ ক্ষণং নৃত্যতি।
ক্ষণং শ্বসিতি মঞ্চুতি ক্ষণমুদার হাহা রুতিং
মহাপ্রণয় সীধুনা বিহরতীহ গৌর হরিঃ॥

মহাভাবামৃত রসে মগ্ন হইয়া গৌরহরি কখন হাস্য করিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, কখন ধাবিত হইতেছেন আবার কখন নৃত্য করিতেছেন, কখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, আবার কখন হাহাকার করিয়া উঠিতেছেন। এমন গৌরহরি আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন।

উক্ত কথাগুলি কাশীর শত শত সন্ন্যাসী শিষ্যের গুরু স্বামীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধে। সুতরাং তাঁহার আশা-আকাঙ্খা আমাতে জাগরিত হইবে এ আমার নিশ্চয়ই প্রগলভতা। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—তবে এ দুরাশা কেন?

সে প্রশ্নের উত্তরে আমার দীন নিবেদন—আমি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও ধনীর বাড়ীর উৎসব আয়োজনে বিনা নিমন্ত্রণে আমার পাত পাতিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তাহার বলেই মাকে একদিন হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, "মা তুমি আবার এসো। আমি দরিদ্র হইলেও বাপ, ঠাকুরদাদা ছিলেন সরকারের খাস তালুকের প্রজা। আমি দশ সালের প্রজা নই, পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টে বাস করি (অবশ্য এটি সেই ইংরেজ আমলের কথা)। তুমি এ দরিদ্রের বাড়ীতে দেখা দিলে তোমার আদর-যত্নের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" মাও আমার প্রার্থনা রাখিয়াছেন। দীনের আশা-আকাঙ্খা বুঝিয়া এ অনিকেতনের নিকেতনে করুণাময়ী দেখা দিয়াছেন অনেকবার অনেকভাবে—ইহা না বলিলে অকৃতজ্ঞতা হয়। মায়ের যে চিত্রপট-খানি জীবনে প্রথম দেখিতে পাই (অথচ মায়ের নামটিও তখন

কাঁহারও নিকট কখনও শুনি নাই) সে পটে দেখিয়াছিলাম অর্দ্ধ নিমীলিত নয়ন অথচ জাগ্রত অবস্থার এক দিব্যমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিতে মাকে কয়েকবারই দেখিয়াছি তবু কেন যেন বার বার ঐ মূর্ত্তিতেই দেখিতে সাধ হয়। অনেকেই সমুদ্র সৈকতে দাঁড়ানো মায়ের একখানি ফটো দেখিয়াছেন। উহা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যেন এক সমুদ্রকন্যা দাঁড়াইয়া আছেন ও তাহার অঙ্গে অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে লীলা তরঙ্গ। আবার মাকে দেখিয়াছি সে যেন এক উচ্চ বনিয়াদি ঘরের এক বর্ষিয়সী মহিলা—তাঁহার শান্ত শীতল নীরব ছায়াতলে তাঁহার ছেলেমেয়েরা গৃহী বা সন্ন্যাসী, দূরাগত অতিথি সকলে পারস্পরিক সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছেন এক মহান্ আদর্শ—বিশ্বজোড়া মাতৃত্ব-বোধ। ভোলানাথের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে মায়ের একখানি ফটো আছে—গৈরিক বসন পরিহিতা রুক্ষ কেশ। কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, শাঁখা, সিঁদুর, শাড়ী বা সর্ব্ব উপাধিহীন একখানি থান ধুতির কোনটিতে মাকে ভাল মানাইল। (চলিত ভাষায় বলিতে গেলে নারায়ণের শোয়া-বসা দুই-ই সমান)। হাস্য কল্লোলরতা মায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলে সকলেরই মনে হয় ঐ তনুখানি যেন আনন্দ ছানিয়া গড়ানো হইয়াছে। দিল্লীতে একবার মায়ের জন্মোৎসব হইয়াছিল—অরুণ উদয়ের সাথে ও আননে দেখিয়াছিলাম এক অপূর্ব্ব কমনীয়তা, লাবনী যেন মোমের মত গলিয়া পড়িতেছিল। কলিকাতা, যোধপুর পার্কে শ্রীসুখময় চক্রবর্তী মহাশয়ের মেয়ে মুন্নী—মায়ের একখানি ফটো সংগ্রহ করিয়াছে—মা অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা, তপক্লিষ্টা, সাধনদীপ্তা—যেন পার্ব্বতী। এই সময়টাকেই মায়ের অজ্ঞাতবাস বলা যায়। এই সময় পূজনীয় নিশিবাবু ভক্তিভাজন প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও ভাইজী প্রমুখ মুষ্টিমেয় ভক্ত ব্যতীত কেহই জানিতেন না ভোলানাথের পর্ণকুটিরে কি রত্ন বিরাজ করিতেছে। ১২ই মার্চ তারিখের দর্শনকে তদ্রূপ দর্শন আখ্যা দেওয়ার কারণ বলিতে

গিয়া অনেক কথা বলিতে হইল। এখন বলিব ১৩ই তারিখের দর্শনের কথা।

১৩ই তারিখ আবার নিরাময় ভবনে পৌঁছিয়া জানিতে পাইলাম মা বাহিরে গিয়াছেন—অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিবেন। উপরে উঠিবার সিঁড়ির নিকট পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম—মনে করিলাম পথের পাশে না দাঁড়াইলে মায়ের দর্শন অসম্ভব। ১০/১৫ মিনিট পরেই ঐ স্থানে মায়ের দর্শন মিলিয়া গেল অতি নিকট হইতে —ঝাঁকি দর্শনের মত, একটি বলিষ্ঠ বেষ্টনীর ভিতর। এবার অসঙ্কোচে বলিতে পারি ঐ এক ঝলকের দর্শন আমার পক্ষে যথেষ্ট। ছোট আধার—এক ঝলকে দুই তীর উছলাইয়া পড়িল দাতার অপার করুণা। নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া অফিস ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। ২০/২৫ মিনিট পরে মায়ের এক ভক্ত (শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ রায়) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি মায়ের নিকট যাবেন ?" আমি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আমাকে সিঁড়ির দরজা পার করাইতে না পারিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন ও আশ্বাস দিলেন তিনি নিজে আমাকে মায়ের নিকট নিয়া যাইবেন। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া দ্বিজেনবাবুকে আর দেখিতে পাইলাম না এবং অনর্থক তাহাকে পুনরায় ব্যতিব্যস্ত করিতেও ইচ্ছা হইল না। তখনই সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম একই মাউণ্টে সুখ দুঃখের একখানি পরিষ্কার ছবি নিয়া। ১৪ই মার্চ আর নিরাময় ভবনে যাইতে পারিলাম না। ঐ দিনই মা রওয়না হইয়া গেলেন গাজিয়াবাদে—এম. পি. শ্রীসীতারাম জয়পুরীয়ার বাড়ী দোল উৎসবে শত খোল ও বাদক ও অন্যান্য পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া। এই 'শত খোল উৎসব'টি নাকি শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সময় হইতে পাণিহাটিতে হইয়া আসিতেছিল। সে উৎসবটি এবার মায়ের ইচ্ছা ও উপস্থিতিতে সম্পন্ন হইল গাজিয়াবাদে। অবশ্য এই ব্যতিক্রমের একটা সিগনিফিকেন্স আছে —সময়ে হয়ত উহা প্রকাশ পাইবে।

যাহাহোক পরে শুনিতে পাইলাম মা ঐদিন ট্রেনের সময়ের অনেক পূর্ব্বে নিরাময় ভবন হইতে বাহির হইয়া আমাদের বাসার কাছে গল্ফ ক্লাব মাঠে অনেক সময় বসিয়া ছিলেন। মায়ের দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে ; ভাগবতের ভাষায় উহা, "দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্" (তাঁহাকে যতই দেখা যায়, মন ও নয়নের আগ্রহ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে)। অপরপক্ষে তাঁহার রূপরাশিও ক্রমবর্দ্ধনশীল। মাকে দেখিয়া আমারও কখনো আশ মেটে নাই। সুতরাং উপরোক্ত ঘটনাটির কথা যখন জানিতে পাইলাম তখন মনে হইতে লাগিল—মা আমার বাড়ীর দরজায় আসিয়াও আমাকে দেখা দিলেন না (গল্ফ ক্লাবের মাঠ ও আমার বাড়ী বলিতে গেলে কয়েক গজের ভিতর) সকল দেখার আনন্দ ছাপাইয়া জাগিতে লাগিল এক দুঃখ ও অভিমান।

পুরাপুরি তিন মাসের ব্যবধানে ১৬ই জুন ঢাকুরিয়া পোষ্ট অফিসে একটু কাজে গিয়াছিলাম। সাধারণতঃ আমি পোষ্ট অফিসে যে পথে আসি যাই কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম হইল। পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক কাউণ্টারেও ব্যতিক্রম ঘটিয়া গেল। ১০টা বাজিতে না বাজিতে কাউণ্টারের কেরাণীবাবু আমার কাজটি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব পথে ফিরিয়া আসিতে যখন ঢাকুরিয়া ষ্টেশন রোডের মন্দির বাড়ীটার কাছে পৌঁছাইলাম তখন কে যেন ডাকিয়া বলিলেন, "শিবেনদা, মা পেছনের গাড়ীতে আসিতেছেন।" সহসা চোখ উঠাইয়া দেখিলাম শশধর দাদার গাড়ীখানা আমার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। আমি পথের পাশে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—ঐটুকুই ছিল আমার প্রস্তুতি বা সম্বল। ৭।৮ সেকেণ্ডের ভিতর মায়ের গাড়ীখানা আসিয়া আমার নিকট একটু থামিল। আমি নতমস্তকে একটি প্রণাম জানাইতেই গাড়ীখানা আমার পাশ কাটিয়া শশধর দাদার গাড়ীখানা অনুসরণ করিয়া একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিল। মায়ের সাথে তখন

ছিলেন স্বামী পরমানন্দজী, শ্রীযুক্ত রণজিৎ ব্যানার্জী ও এক মহিলা ভক্ত। মনে করিলাম গাড়ীখানা যখন গলির ভিতর ঢুকিয়াছে তখন সে আর কতদূর যাবে? (বিশ্বজোড়া ভগবানকে ধরা বড়ই কঠিন, মাটির গড়া ছোট ঠাকুরকে ধরা যায় সহজে ও সর্ব্ব অবয়ব দিয়া)। পেছনে পেছনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মায়ের গাড়ীখানা ধরিয়া ফেলিলাম একটা বাড়ীর সামনে। স্বামীজী ও শ্রীযুক্ত রণজিৎ ব্যানার্জী নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন। মা সকলের দরজা আগলাইয়া দাঁড়ান—এবার আমি মায়ের দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইলাম ও নতজানু হইয়া একটি প্রণাম করিলাম। অনেকদিন পরে সে মুখে শুনিতে পাইলাম; "কেমন আছ?" আমিও মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, তুমি কেমন আছ?" মা বলিলেন, "ভাল না।" পরে শুনিলাম মায়ের গায়ে তখন বেশ জ্বর। জ্বর নিয়া মা এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘোরাঘুরি করিতেছেন এবং কয়েকটি মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্যই মায়ের কলিকাতা আসা। ইতিমধ্যে তিন-চার জন লোক মায়াদিকে একটি চেয়ারে বসাইয়া মায়ের কাছে আনিয়া হাজির করাইলেন। মা তাহার অসুখ ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থার কথা শুনিলেন। মায়াদি বলিলেন, "মা, আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন নিরাময় হইয়া উঠি।" এ বেলা দেখিলাম মা আদতে ভুল করেন না। ঐ সোজা সরল মেয়েটি বলিতে লাগিলেন, "ঐরূপ প্রার্থনা করবে কেন? বল্‌বে ভগবান আমার মঙ্গল কর। ডাক্তার যেমন চলতে বলবে তেমন ভাবে চলবে ও তাঁর নাম করবে।" ইতিমধ্যে গলির ভিতর ভীড় জমিয়া গেল। মায়ের গাড়ীও তখনই সে জায়গা ত্যাগ করিল—অপেক্ষা করার সময় ছিল না। আমি আর একটি বার প্রণাম করিবার সময় পাইলাম না। দুইদিন পরে শশধর দাদাকে আমার কৃতজ্ঞতাটি জানাইবার জন্য তাহার বাড়ী গেলাম। তিনি আমার হাতে একটি আম তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "মায়ের প্রসাদ মা নিজ হাতে দিয়াছেন।" এখন আমার একটি প্রশ্ন রহিল—মা, আমার

যে প্রণাম করাটি মুলতুবী রহিল সে প্রণামটি নিতে আবার কবে আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইবে?

---

(১০)

রেমুনায় গোপালদেবের সেবা দেখিয়া বিরক্ত ভক্ত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর বাসনা জাগিয়াছিল :—

অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥

চৈঃ চঃ মা৪।১২০

শশধর দাদা ও তাঁহার স্ত্রী ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গাপূজার সময় হরিদ্বার গিয়া দেখিতে পাইলেন নাভার মহারাজার মাতৃসেবার পরিপাটি। তাহাদের প্রাণে জাগিয়া উঠিল, তাহারাও ঐরূপ মাকে কলিকাতা আনিয়া আনন্দোৎসব করিয়া ধন্য হন। তাহারা তাহাদের মনের কথা স্বামী পরমানন্দজীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। মা ঐ সময় হইতে কখন কোথায় থাকিতে পারেন পর্য্যালোচনা করিয়া অদূর ভবিষ্যতে মায়ের কলিকাতা আগমনের কথা স্বামীজী তখনই একরূপ নাকচ করিয়া দিলেন—হরিদ্বারের বৈঠকে। যে তরঙ্গের জন্ম সাগর উপকূলে সে তরঙ্গ তীরে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হইয়া যায় কিন্তু ঐ ভক্ত হৃদয়ের তরঙ্গের জন্ম হইয়াছিল সাগরগর্ভে—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর হৃদয়ে সুতরাং উহা বিলীন হইয়া গেল না। উহার পূর্ব্বেই দিল্লী বসিয়া মায়ের মুখে একটা কথা শুনা গিয়াছিল, "কলিকাতার লোকদের যে আর্ত্তি দেখিয়া আসিলাম উহাতে এই শরীরটার আবার কলিকাতা যাওয়ার খেয়াল হইতেছে।" এ ঘটনা ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের নিরাময় ভবনে মায়ের শুভ পদার্পণ ও সেখান হইতে ফিরিয়া যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা। সুতরাং দেখা যায় শশধর দাদার সাধটি জন্ম নিয়াছিল মায়ের খেয়াল জাগিবার পরে।

শশধর দাদা কলিকাতা ফিরিয়া আসিতেই তাহার আকুলতা ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন আর দুইটি সরসপ্রাণ শ্রীমতী পদ্মা কুণ্ড ও তাহার স্বামী শ্রীযুত প্রতিভা কুমার কুণ্ড। এই ব্যাপার নিয়া শশধর দাদা ও স্বামীজীর ভিতর বহুপত্র বিনিময় ও একাধিকবার কলিকাতা বসিয়া পরস্পর আলোচনা হইল। এ অনুষ্ঠানে কি পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইতে পারে স্বামীজী উহা শশধর দাদাকে অবহিত করাইলেন। শশধর দাদা ঐ অর্থের প্রাথমিক দায়িত্ব নিয়াই কার্য্যে ব্রতী হইলেন কুণ্ড পরিবারের সোৎসাহ সমর্থন পাইয়া।

মায়ের অনুমোদন পাইয়া স্বামীজী ১৯-১১-৭৩ তারিখ শশধর দাদাকে পত্র দিলেন। ঐ পত্রের প্রতিলিপি দেখাইয়া শশধর দাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই শুভ অনুষ্ঠানের কোন কার্য্যটির ভার নিবেন ?" আমি তখনই তাহাকে জানাইয়া দিলাম, "এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্রতম কাজটি করিতেও আমি অক্ষম।" অবশ্য তাহার অগোচরে মনে মনে আমি একটি কার্য্যের ভার নিয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গে নবান্নে কাক নিমন্ত্রণের মত আমি এ বিষয়ে উৎসাহী যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইতাম তাহাকেই বলিয়া দিতাম মা শীঘ্রই কলিকাতা আসিতেছেন। সুখের বিষয় আমার নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন—সপরিবারে, সবান্ধবে। উহাদের ভিতরের এক ব্যক্তির মন্তব্য ছিল এইরূপ—"সে দিন (১লা মার্চ) শ্রীশ্রীমাতাজীকে দেখিতে পারিয়া আমরা সকলে (পরিবারের ৫ জন) বিশেষ সুখী হইয়াছি। তবে উহাতে আমাদের দেখার আকাঙ্খা নিবৃত্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। জানিনা এ জীবনে পুনর্ব্বার মাকে নিকটতর স্থান হইতে দেখিবার আর কোন সুযোগ পাইব কিনা? চাক্ষুষ দেখার সুযোগ না হইলেও মানসিক দর্শন চলিতেই থাকিবে মনে হয়।" এই ব্যক্তিটি ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চরণাশ্রিত জন। আমার ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীসত্য রঞ্জন ঘোষ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার একটি বিশেষ বন্ধু। বন্ধুটিকে নিজে সঙ্গে করিয়া ভাগবত সপ্তাহ মণ্ডপে নিয়া আসিব এইরূপ কথা দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার অসুস্থতা বশতঃ উহা সম্ভবপর হইল না। বন্ধুটি একটু সুস্থ হইলে একদিন একটি লোক সঙ্গে নিয়া মাকে দেখিতে আসিলেন। মা তখন মণ্ডপে আসেন নাই। ভদ্রলোক দুর্ব্বল শরীর নিয়া অধিক সময় অপেক্ষা করিতে অক্ষম। ডাঃ মহানামব্রতের অনুগত ভক্ত বালিগঞ্জের শ্রীযুত অমিয় চৌধুরী মহাশয় তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে পরামর্শ দিলেন, "মা এই মোটরটিতে মণ্ডপে যাইবেন, আপনি উহার সন্নিকটে দাঁড়ান, মা মোটরে উঠিবার সময় নিশ্চয়ই একটু দেখা পাবেন।" ভদ্রলোক দুর্ব্বলতা বশতঃ একবার বসেন, একবার দাঁড়ান। এই করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "মা যদি আসিয়া একবার গাড়ী বারান্দায় দাঁড়ান তবে আমরাও দেখিতে পাই, মায়েরও কষ্টের লাঘব হয়।" এক ভদ্রলোক অমনি বলিয়া উঠিলেন, "মাকে আপনারা একটু বিশ্রাম করিতে দিবেন না? মায়ের পায়ে এখন তৈল মালিশ হইতেছে। আপনারা স্বার্থপর, ইত্যাদি।" বন্ধুটি অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। করুণাময়ী তখনই ঝট্ করিয়া গাড়ী বারান্দায় আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে মণ্ডপে যাও, আমি এখনই মণ্ডপে যাইতেছি।" এ ভদ্রলোকের দীক্ষাকালে গিরিমহারাজ ইহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন এক অভিনব উপায়ে। তাহা না হইলে এরূপ সৌভাগ্য ক'জনার হইয়া থাকে। বন্ধুটির নাম শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার।

তৃতীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আমার গুরুভ্রাতা ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীমাখন লাল গুহ, মায়ের এক কালের সেবিকা ভ্রমরের মেয়ে চন্দনার শ্বশুর। এই চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধকে মা দেখা দিতে গিয়াছিলেন বৃদ্ধের বাড়ী দক্ষিণ কলিকাতার নাকতলায়। এইটিই তাহার প্রথম মাতৃদর্শন। চন্দনাই মাকে সাথে করিয়া নিয়া গিয়াছিল। মায়ের

গাড়ীর পেছনে পেছনে চন্দনার ট্যাক্সি—চন্দনা ট্যাক্সিতে একা। মূর এভিনিউ পৌঁছাইয়া চন্দনার ট্যাক্সি পথ ভুল করিয়া বসিল। মা পেছনে চন্দনার ট্যাক্সি দেখিতে না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখনই মা গাড়ী থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন ও লোক পাঠাইলেন ঐ ট্যাক্সির খোঁজে। মা ইহার ভিতর একবার বলিলেন, "ওদের বাড়ী যাইতেই হইবে।" ইতিমধ্যে চন্দনার ট্যাক্সিখানা সেখানে আসিয়া পৌঁছাইয়া গেল। মা চন্দনাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া তাহার অশীতিপর বৃদ্ধা বাতব্যাধিশায়ী শাশুড়ীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "এ বয়সেও শাখা সিঁদুর বজায় রহিয়াছে লক্ষ্মী।" মা বিদায় কালে চন্দনার শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলিলেন, "আমাকে দেখিয়াছত ? আবার দেখিয়া নাও।" চন্দনার শ্বশুর মাকে প্রশ্ন করিলেন, "মা ; তুমিত আমাকে চেন ?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমাকে চিনি।" চন্দনার বিয়ের পর যখন চন্দনার স্বামীর দীক্ষা হয় (বোধ হয় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে) তখনই মা বলিয়াছিলেন, "বৈষ্ণব পরিবারের একটি ছেলে আজ এখানে দীক্ষা পাইল।" মা সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তকে জানেন বলিয়াইত তিনি সর্ব্বজন জননী।

মায়ের আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হওয়ার সহিত ভাগবত সপ্তাহের স্থান নির্ব্বাচন নিয়া ভক্তদের ভিতর একটু মতদ্বৈত দেখা দিয়াছিল। বাঁধন শক্ত করিতে হইলে উহার দুই প্রান্ত নিয়া একটু টানা-হেচরা করিতে হয় ; ঐ মতদ্বৈতটি ঐ টানা-হেচরার মতই কাজ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। স্বামীজীর হস্তক্ষেপে সকল মতামত হইয়া গেল এক। কিন্তু একটি কথা বোধহয় আজও কেহ ভুলিতে পারে নাই। কুণ্ড পরিবার পূর্ব্বাপর স্থির নিশ্চয় ছিল—মা তাহাদের নিরাশ করিবেন না। মায়ের থাকার দ্বিতল বাড়ীটি যাহাতে যথাসময় তৈয়ারী হয় সে বিষয়ে তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী পদ্মা এক গয়লাকে ১০০০ টাকা অগ্রিম দাদন দিয়া একটি গাই কিনাইল—উদ্দেশ্য মায়ের খাওয়ার খাঁটি দুধের যাহাতে অনটন

না হয়। মা যে কয়টি দিন যোধপুর পার্কে ছিলেন ততদিন ঐ দুধ ব্যতীত অন্য কিছু খাইতেন না। নিউ আলিপুর ও আগরতলা আশ্রমেও ঐ গাই-এর দুধ পাঠান হইত। মা ঐ দুধ খাইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন (দুধের না সেবার উহাই বিবেচ্য)। সাথে সাথে স্বামীজীর নির্দ্দেশে ভাগবত সপ্তাহের মণ্ডপটির প্ল্যান তৈয়ারী হইয়া গেল নির্ম্মলানন্দের পরিচালনায় দিল্লীর একটি ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল—মায়ের পায়ে আমার একটি প্রণাম মুলতুবী রহিল। মা সেই মুলতুবী প্রণামটি কি ভাবে আদায় করিলেন আমি এখন সে বিষয়ে কিছু বলিব। প্রথম নিমন্ত্রণ পত্রে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল ভাগবত পারায়ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ পর্য্যন্ত। পরবর্তী বিস্তৃত কার্য্য-সূচীতে জানা গেল, "মা আসিতেছেন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী—ভাগবত সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হইবে ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ। পরের রুটিন অনুযায়ী মা ২৩শে ফেব্রুয়ারী তুন এক্সপ্রেসে পৌছাইতেছে জানিয়া ঐ তারিখ প্রাতে ৮টার সময় শ্রীযুত প্রতিভা কুমার কুণ্ড মহাশয়ের ৪৩২ নং প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডের বাড়ী পৌছিয়া দেখিলাম মায়ের থাকার নূতন বাড়ীটি ধুইয়া-মুছিয়া ঝক্-ঝকে চক্-চকে করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহাতে মায়ের প্রত্যেক পদচিহ্নটি ফুটিয়া উঠে তাহার বুকে সুস্পষ্ট ভাবে। বাহিরে ভাগবত মণ্ডপকে কেন্দ্র করিয়া বহু দর্শনার্থী পায়চারি করিতেছেন নগ্ন পদে, মালা হাতে এবং চকিত হইয়া উঠিতেছেন তাহারা ততবার, যতবার আনোয়ার শাহ্ রোড দিয়া মোটরগুলি হর্ণ বাজাইয়া চলিতেছিল। (পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানন্—কবির কল্পনা নয়—বাস্তব সত্য)। ষ্টেশনে ফোন করিয়া জানা গেল গাড়ী ৩ ঘণ্টার উপর লেট্। তখন ভাগবত কথার কথকের পরিবর্ত্তে মিলিয়া গেল এক মাতৃকথা কথক। মায়ের পুরাণ ভক্ত শ্রীযুত রাধিকা লাল তরফদার (এডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট) তিনি

বলিতে লাগিলেন কেমন করিয়া তিনি আসিয়াছেন মায়ের স্নেহ ছায়াতলে। (১) আমি তখন ঢাকা কোর্টে ক্রিমিনাল সাইডে প্র্যাকটিস করি—অল্প বয়স, উঠতি পশার। একদিন রমনার মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে অদূরে শুনিতে পাইলাম মাতৃনাম কীর্ত্তন। কৌতূহল বশতঃ অগ্রসর হইয়া সন্ধান মিলিয়া গেল ঐ নামের নামীর। ঐ একদিনের দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম ঐ নামীর প্রতি। ঢাকায় তখন মনোহরা সন্দেশের বেশ নাম যশ। মাঝে মাঝে মায়ের জন্য ঐ সন্দেশ নিয়া যাইতাম। মা কালে ভদ্রে উহার এক আধ টুক্‌রা মুখে দিতেন আমার মনোরঞ্জনের জন্য। মা একদিন আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, "বাবা তোমার সন্দেশ সুস্বাদ বটে কিন্তু আমি সমধিক ভালবাসি ভগবানের নাম। তুমি নিজে ভগবানের নাম করিবে এবং আমাকেও শুনাবে।" এই সময় হইতে মা আমাকে করিয়া দিলেন নামের পূজারী।

(২) হঠাৎ আমার খেয়াল হইল মাষ্টার অফ্‌ ল' পাশ করিতে হইবে। ছাত্রাবস্থায় মেধাবী ছাত্র বলিয়া আমার একটু খ্যাতিও ছিল—লাগিয়া গেলাম সাধনায়। একদিন মায়ের নিকট গিয়া বসিতে না বসিতে মা আমার দিকে তাকাইয়া, "ফেল, ফেল" বলিয়া হাতে তালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন, যেন এর জন্যই তিনি প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। মনটা একটু খারাপ হইলেও দমিয়া গেলাম না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন পণ করিয়া পড়িতে লাগিলাম। মন্ত্রের সাধন আর হইল না; অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর (চোখ দুইটির) পতনের সম্ভাবনা উপস্থিত হইল। এমন সময় মা আমার এক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিয়াদিলেন, "রাধিকা তাহার পূর্ব্ব জন্মের শুভ সংস্কারগুলি হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে। ওকে প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতে বলিও—চোখ দুইটিও ভাল হইবে, নষ্ট স্মৃতিরও উদ্ধার হইবে।" আজ আমি বুঝিতেছি মঙ্গলময়ীর ঐ দিনে ফেল ফেল বলিয়া হাতে তালি দেওয়ার উদ্দেশ্যটি ছিল কি।

(৫) মায়ের বাবা এমন দরিদ্র ছিলেন যে মেয়েকে দুধ কিনিয়া খাওয়ান এমন অর্থ তাহার ছিল না। পাড়ার এক ভদ্রমহিলা ঐ টুক্‌টুকে মেয়েটি দেখিয়া তাহার মায়ায় পড়িয়া গেলেন। তিনি নিজে আসিয়া নিজেদের গাই-এর একটু দুধ দিয়া যাইতে লাগিলেন মাকে খাওয়াবার জন্য। ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন অতি কৃপণ। তিনি স্ত্রীর কার্য্যে বাধা দিলেন। এইরূপে যেদিন হইতে মায়ের দুধটুকু বন্ধ হইয়া গেল সেদিন হইতে ভদ্রলোকের গাইটিও প্রভুর দুধ যোগান বন্ধ করিয়া দিল (মনে পড়ে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের কথা)।

উকিল মানুষ রেফারেন্সের ভাণ্ডার। যখন তিনি এইরূপ একের পর এক বলিয়া যাইতেছিলেন তখন হঠাৎ রাস্তায় যাহারা দাঁড়াইয়া ছিলেন বলিয়া উঠিলেন, "ঐ মায়ের গাড়ী আসিতেছে।" অমনি সকলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন রাস্তার দুই ধারে। মেয়েদের শঙ্খ, উলু ধ্বনি ও সমবেত জনমণ্ডলীর "জয় মা, জয় মা" ধ্বনির ভিতর মায়ের গাড়ীটি বাড়ীর ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আমিও বাহির হইতে মায়ের উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম। প্রথম কারণ বেলা তখন ১১॥ টা —মায়ের একটু বিশ্রামের দরকার, দ্বিতীয় কারণ সেখানে উপস্থিত থাকিলেও মায়ের নিকট যাইয়া তাহাকে দর্শন করিতে পারিব সে আশা আমি পোষণ করিতে পারিতেছিলাম না।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। আজ মা সবাইর প্রণাম নিবেন— ইহা ব্যতীত বিশেষ কোন কার্য্যসূচী ছিলনা বলিয়াই জানিতাম। মা প্রাতে ৯টার পর (৯।২০ মিনিট হবে) প্ল্যাটফর্মের উপর আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। প্রকাণ্ড মণ্ডপ, কয়েক সহস্র লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। ছেলেদের ও মেয়েদের জায়গা ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাঝখানে একটি প্রশস্ত পথ রাখিয়া। ছেলেরা ও মেয়েরা দুই দিকে মালা হাতে লাইন দিয়া দাঁড়াইলেন। এক এক জন মাকে প্রণাম করেন, মালা দেন ও সরিয়া দাঁড়ান যাহাতে

তাহার পরবর্তী ভক্ত সুখে ও স্বচ্ছন্দে মাকে তাহার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারেন। এরূপ সুবন্দোবস্ত কলিকাতার জীবনে বোধহয় এই প্রথম। সেদিন কাহার কোন অভিযোগ করার মত ছিল বলিয়া আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই। আমি কিন্তু ৮॥ টায় মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া যত্র বসিয়াছিলাম তত্র বসিয়া রহিলাম। আমার পা কোন মতেই ঐ লাইনের ভিতর দাঁড়াইতে রাজী হইল না, মালা নিয়া যাওয়াত দূরের কথা ; কেননা আমি সে বিষয়ে চির অনভ্যস্ত। মা এক ঘণ্টার মত সময় বসিয়া সকলের সাধ পূর্ণ করিলেন। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেখান হইতে একটি প্রণাম করিয়া মণ্ডপের বাহির হইতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের ছেলে শ্রীমান খোকা আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "শিবেনদা, আপনি মায়ের কাছে যাবেন না ?" আমি উত্তর করিলাম, "না ভাই, আমার লজ্জা করে।" শ্রীমান তখন আমাকে একরকম জোর করিয়াই মায়ের দিকে এগিয়ে দিল। লাইনের ভিতর তখন গোপালদা ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। গোপালদা নীচে মায়ের সামনে দাঁড়ান ছিল। অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিতেই কি জানি কেন আমি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। আমি সেখান হইতেই মাকে আমার মুলতুবী প্রণামটি জানাইলাম ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া। তারপরে কি করিয়া মায়ের নিকট গিয়াছিলাম উহা আমি বলিতে পারি না। ছিলাম অধোমুখী মায়ের মুখখানা দেখিতে উর্দ্ধমুখী হইয়া তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম সে আনন স্বীয় দীপ্তিতে দীপ্যমান। আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন—গিরিগিটি যখন আপন আনন্দে বিভোর থাকে তখন তাহার বক্ষস্থল ক্রমেই লাল হইয়া উঠে। সাপ যখন রাগিতে থাকে তখন তাহার শরীর ক্রমেই ফুলিতে থাকে। মায়ের রং বদলান ও শরীরের হ্রাস বৃদ্ধি ঐ রকমই একটি ব্যাপার। যাহাহোক আমার ঐ সন্ধিক্ষণে গোপালদা আমার হাতে মায়ের প্রসাদ দুইটি ফল ও একটি ফুলের

তোড়া তুলিয়া দিলেন। শূন্য হাতে গিয়া পূর্ণ হাতে ফিরিয়া আসিলাম—হৃদয় ভরা আনন্দে।

এখন লিখেছি অন্য একদিন মাকে খুব নিকট হইতে দেখিবার একটি অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়াছিল আমার নিকট কি ভাবে। ১লা মার্চ ১১ টার সময় ভাগবত মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া ৫১৮/বি যোধপুর পার্কে সুখময় বাবুর বাড়ী যাই, অবশ্য বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বাড়ীতে কেহ না থাকায় ফিরিয়া ৩৭নং বাস ষ্ট্যাণ্ডে যাইবার পথে যোধপুর পার্ক বাজারের নিকট আসিয়া পৌছাইতে শুনিলাম কাহারা যেন সমস্বরে ডাকিতেছে, "শিবেনদা, শিবেনদা।" ফিরিয়া দেখিলাম সুখময়বাবুর স্ত্রী ও মেয়ে মুন্নী আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ না দিয়া তাহারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "মা কাল বৈকালে ৬।৬॥ টার সময় আমাদের বাড়ী আসিবেন। নিমন্ত্রণ কথাটি ছিল উহ্য। উহাদের আনন্দাতিশয্যে আমার মনেও একটা দোলা দিল। ২রা মার্চ যথাসময় ঐ বাড়ী গিয়া দেখি পরিবারস্থ সকলে মায়ের প্রতীক্ষায় করিতেছিল ঘর ও বাহির। মা যখন আসিলেন তখন রাত ৮ টা—লোড শেডিং-এর জন্য চতুর্দ্দিক অন্ধকার। গৃহস্বামিনী মোম বাতির আলোর সাহায্যে মাকে বরণ করিতে লাগিলেন মনের আনন্দে, কম্পিত হস্তে। পেছনের মোম বাতিতে হঠাৎ তাহার শাড়ীতে আগুন ধরিয়া গেল। ভগিনী রেবা তখন দ্বিতীয় অভিনিবেশ শূন্য। শাড়ীটার বেশ কতকটা পুড়িয়া গেল, আগুন নিভাইল শান্তি ভাই। (বীরেন ও শান্তি ভাই ভাগবত সপ্তাহের কয়টি দিনই ঐ বাড়ীতেই ছিল)। মা নিরুদ্বেগে বসিয়া সকল দেখিতেছিলেন। কোন অদৃশ্য হস্ত যেন কেমন করিয়া সকল দিক সামলাইয়া নিল।

তারপর আর একটি কথা। দর্শনার্থীগণ যখন মাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল মা নিজ হাতে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

সুখময়বাবুর ছেলে খোকন তখন ছিল বাহিরে। মায়ের সতর্ক দৃষ্টি হইতে খোকন বাদ পড়িল না। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে কোথায়?" খোকন কাছে আসিতেই মা তাহার হাতে একটি সন্দেশ তুলিয়া দিলেন।

শেষ অধ্যায়—শ্রীযুত রণজিৎ ব্যানার্জী (সভাপতি ভাগবত সপ্তাহ কমিটি) ও শ্রীযুক্ত অমল চন্দ্র সেন মহাশয় উভয়ে পৃথক পৃথক ভাবে আমাকে উৎসব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "কেমন দেখলেন?" আমার মতামত অপেক্ষা প্রশ্নকর্ত্তাদের গুরুত্ব মনে করিয়া আমি ঐ প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

(১) শ্রবণ, স্মরণ মনন সকলই সাধনের এক একটি পূর্ণ অঙ্গ ও উহার যে কোন একটির অকৃত্রিম সাধন দ্বারা ভগবানের সন্তোষ লাভ করা যায়। ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল ভাগবত পাঠই শ্রীনারায়ণ গোস্বামীর সাধনা। ভাগবত ছিল আমার গুরুদেবের প্রাণস্বরূপ। তিনি একসময় উপবাসী থাকিয়া ৭ দিনে সমগ্র ভাগবতখানি পাঠ করিয়াছিলেন। উহার ভিতর একদিন তাঁহার শরীর বেশ অসুস্থ হইয়া পড়ে ও দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়—তিনি পাঠে অশক্ত হইয়া পড়েন। এ অবস্থায়ও গুরুদেব তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন না, চোখ বুজিয়া আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। কিয়ৎ সময়ের ভিতর নামিয়া আসিল শ্রীমদ্ভাগবতের করুণা। চোখ মেলিয়া দেখিলেন ভাগবতের প্রতিটি বর্ণ উজ্জ্বল ও বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। গুরুদেব যথাসময় ভাগবত পাঠ শেষ করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। সাধকের সাধন বিষয়ে ইহার অধিক বলা আমার বাতুলতা।

(২) ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক বলিতেছেন

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥

ভাগবত মণ্ডপে ঐ কথার স্বার্থকতা বুঝাইবার জন্য দুইটি দিক হইতে দুইটি প্রচেষ্টা চলিয়াছিল দুইটি মনীষীদ্বারা। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী মহাশয় যতবারই ব্রহ্ম, আত্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহাশয় ততবারই বলিয়াছেন, "গোপাল, গোপাল ব্রহ্ম গোপাল" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" ইত্যাদি। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন সাধন দ্বারা এই ব্রহ্মকে আত্মাকে এই জীবনে জানিতে না পারিলে মহতী বিনষ্টি। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিয়াছেন, "জীব তুমি সাধন করিবে কি? তোমার সামর্থ্য কতটুকু? ভগবান জীবের জন্য সাধন করিতেছেন; তাহার সাধনার ফল তাহার করুণাঘন মূর্ত্তি—যুগে যুগে অবতার রূপে। জীবের কর্ত্তব্য তাহার মুখপানে তাকাইয়া থাকা।" অধ্যাপক মহাশয় মহাভারত ও ঋগ্বেদ হইতে ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বক্তব্য ছিল জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভালবাসা—প্রেম। এই প্রেমদ্বারা ভগবানের সাথে নানাভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, ভগবানকে সম্ভোগ করা যায়। ভগবান কৃষ্ণ গোপী প্রেমের ঋণ অপরিশোধনীয় বলিয়া গৌর হইয়া আসিয়াছেন। তবে এই দুই মনীষীর কার্য্যের লক্ষ্মণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় বোধ হয় একই কেননা উভয়ে ভাষণ শেষ করিয়া নতজানু হইয়া বার বার প্রণাম করিয়াছেন ঐ একই ব্যক্তিকে।

(৬) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডবদের প্রাধান্য বিস্তার। দিল্লীতে যমুনার প্রকাণ্ড চরায় দেখিয়াছি বহুদিন ব্যাপী এক বিরাট যজ্ঞ (এই যজ্ঞে করপাত্রী প্রভুদওজী মাকে নিয়া আসিয়াছিলেন এলাহাবাদ হইতে প্লেনে)। সেখানে কয়েক হাজার মন শুদ্ধ গব্য ঘৃত পোড়ান হইয়াছিল পর্জ্জন্য দেবের পরিতোষনার্থে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডে চোখের উপর হইয়া গেল আর একটি যজ্ঞ। এটি হল নাম যজ্ঞ যাহাকে ভগবান বলেন যজ্ঞানাং জপোযজ্ঞোঽস্মি। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবানের তুষ্টি।

ভাগবত সপ্তাহের অধিবাসের পূর্ব্বে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সংকল্প কি?" শশধর দাদা উত্তর দিলেন, "ভগবানের তুষ্টি,—মায়ের তুষ্টি।" মা বলিলেন, "কৃষ্ণের তুষ্টির জন্য ভাগবত সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হউক।" ভাগবত সপ্তাহকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুত কুণ্ড মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া মায়ের তত্ত্বাবধানে দীক্ষা পাইলেন ৮০০-র অধিক দীক্ষা প্রার্থী। ভাগবত সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সাফল্য এমন অন্য কোথাও ঘটিয়াছে কিনা জানিনা। এই শুভ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন যে মা বলিয়াছেন, "এমন ভাগবত সপ্তাহ আর হয় নাই—একটি রেকর্ড।"

মোহান্ত বিদায়—মোহান্ত বিদায় কেন মা ভলানটিয়ার বিদায়ও করিয়াছেন নিজ হাতে যজ্ঞ পুরুষকে দক্ষিণে বসাইয়া—মা কখন কোন কার্য্যের বাকী রাখেন না। তবু এই মঙ্গলানুষ্ঠানের কতিপয় উদ্যোক্তার অভিপ্রায় অনুসারে আমি জানাইতেছি তাহাদের কৃতজ্ঞতা তাহাদিগকে যাহারা শারীরিক অথবা বাচনিক সাহায্য দ্বারা অথবা দূরাগত সাধু সজনকে আপন আপন বাড়ী, ঘরে রাখিয়া অপ্যায়িত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন সাফল্যমণ্ডিত। সর্ব্বোপরি তাহাদের জন্য রহিল মায়ের আশীর্ব্বাদ।

—o—

(১১)

আমি মায়ের নিকট আনকোরা নূতন উহা আর বলা চলেনা কিন্তু এই ৩৭/৩৮ বৎসরে মায়ের কথা জানিলাম বা কি বুঝিলামই বা কি? তাই ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ মায়ের ঢাকার এক পুরাতন ভক্তের বাড়ী গিয়াছিলাম মায়ের পুরাণ পূত কাহিনী শুনিবার লালসায়। আমি তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি সেদিন তাহার অতিথি—তিনি মুখ খুলিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিলেন, "শিবেনবাবু, আমি আপনাকে আজ যাহা বলিতে যাইতেছি উহা

তুই একজন ব্যতীত আর কাহাকেও বলিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। তবে একটি কথা—আমার নামটি কোথাও উল্লেখ করিবেন না।" আমিও তথাস্তু বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইলাম। তিনি বলিয়া চলিলেন—আমি মায়ের করুণায় পালিত—বলিতে গেলে জন্মাবধি। আমার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্ত্রী ঐ মা। আমি যখন ঢাকা ইউনিভারসিটির ছাত্র তখন ঢাকা হলের বোর্ডার ছিলাম। তখন প্রথম যৌবন, নূতন উদ্যম সুতরাং আমার কর্ম্মপ্রবণতা তখন একটু বেশীই ছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আমার ঢাকা হলে থাকার সময় ঢাকায় লাগিয়া গেল ভীষণ হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। কে কাহার ধন প্রাণ হরণ করিবে তাই নিয়া ব্যস্ত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হিন্দুরাই মার খাইয়া আসিতেছিল বেশী। প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল শুধু হিন্দু বলিয়া নয়, দুর্ব্বলের জন্য। যেখানে যতটা পারি দুর্ব্বলের পাশে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীদের চোখে উহা দোষ বলিয়া বিবেচিত হইল। একদিন পুলিসের চোখের সামনে বলিতে গেলে নাকের ডগায় যখন হিন্দু মুসলমানের বিবাদ তুঙ্গে উঠিয়াছিল আমি ঘরে লুকাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ফলে সেই বিবাদমান জনতার ভিতর হইতে নারিন্দার পুলের নিকট পুলিসবাহিনী কর্তৃক ধৃত হইয়া আমি হাজত বাসে চলিলাম। ব্যাপারটা ছিল সাধারণ গতানুগতিক ব্যাপার হইতে একটু পৃথক। তাই ঢাকা হলের সকল ছাত্রদের ও তৎকালীন ঢাকা ইউনিভারসিটির ভাইস চেন্সেলর ডাঃ লেঙ্গলের সমবেত চেষ্টায় আমার জামিনে মুক্তি হইল। মোকর্দ্দমা চলিল আদালতে। আমি গুরুতর অপরাধী—আমা কর্তৃক তখনকার এস. পি. সাহেব নাকি গুরুগত ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাক্ষ্য প্রমাণ ঐ ঘটনার যথেষ্ট মজুত আছে।

কিন্তু মোকর্দ্দমাটি যখন পুলিস ও হিন্দু জনসাধারণের ভিতর তখন ঢাকার তৎকালীন প্রখ্যাত উকিল, ব্যারিষ্টারগণ আমার জন্য

বিনা পয়সায় লড়িতে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু বেকসুর মুক্তির ভরসা কেহই দিতে পারিলেন না। আদালতে মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। আমিও নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক শুনানির দিন কোর্টে হাজিরা দিতে লাগিলাম। আমার পক্ষের উকিল ছিলেন শ্রীযুত রসিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ব্যারিষ্টার হইলেন মিঃ পি. কে. বসু। বাদী হইলেন সূত্রাপুরের ও. সি.।

পুলিস মনে করিল তাহাদের জাল হইতে আমাকে মুক্ত করিতে পারে এমন শক্তিমান পুরুষ কেহ নাই। (লক্ষীন্দরের বিবাহ বাসরে যে ছিদ্র থাকিতে পারে চাঁদ সদাগর তাহা কখন বিশ্বাস করিতে পারেন নাই)। যাহাহোক একটি শুনানির দিন আমি যথাপূর্ব্বম আদালতে হাজিরা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হল হইতে বাহিরে আসিয়াছি এমন সময় দূর হইতে দেখিতে পাইলাম ব্যারিষ্টার মিঃ পি. কে. বসুর ক্লার্ক সাইকেলে হন হন করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমি তাহার আগমনের কারণ ভাবিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ভদ্রলোক আমার সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছেন?" এবং আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আনন্দাতিশয্যে তিনি বলিয়া চলিলেন, "আপনার কোর্টে যাওয়ার হাঙ্গামা শেষ হইয়াছে—সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।" আমি সে অভাবনীয় জয়ের সংবাদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রকম?" ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "বাদী ও. সি. হঠাৎ মারা গিয়াছে—এখন আর মোকর্দ্দমা চলিতে পারে না।"

পরে জানিতে পারিলাম বাদী ও. সি. কোন কার্য্যোপলক্ষে নারায়ণ গঞ্জ গিয়া ছিলেন। তিনি নারায়ণ গঞ্জ হইতে ঢাকায় ফিরিতেছিলেন একটি প্রাইভেট বাসে। ঐ রাস্তার বিপরীত দিক হইতে বাসটির দিকে অগ্রসর হইতেছিল এক অশ্বারোহী। ঘোড়াটা ছিল বেশ বলিষ্ঠ কিন্তু অশিক্ষিত অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার করা ও রাস্তার

আইন কানুন মানিয়া চলা তাহার স্বভাবে মানাইতে ছিল না। দূর হইতে ঐ ঘোড়াটা দেখিয়া ও. সি.-র প্রাণ দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ও. সি. বাস চালকের পাশে বসিয়াছিলেন। তিনি ড্রাইভারকে বাসটা একটু থামাইতে বলিলেন। এ বিষয়ে বন্ধুবর আর কিছু না বলিলেও আমার একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য আছে। পরপীড়নরত দুর্বৃত্তের হৃদয় যতই কুলিশ কঠিন হ'ক না কেন মৃত্যুভয় তাহার সকলের অপেক্ষা বেশী—শয়নে স্বপনে সকল বিষয়ে মৃত্যু বিভীষিকা তাহাকে পাইয়া বসে যেমন পাইয়া বসিয়াছিল কংসকে—

আসীনঃ সংবিশন্ তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ পিবন্
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যং তন্ময়ং জগৎ ॥

তবে কংস ও ও. সি.-র ভিতর প্রভেদ অনেক। কংসের ধ্যেয় বস্তু ছিল কৃষ্ণ—অনাবৃত ব্রহ্ম কিন্তু ও. সি.-র ধ্যেয় বস্তু স্বয়ং কাল।

এখন দেখা যাক্ তারপরে কি হইল। ড্রাইভার বাস থামাইলে কি হইবে ? ও. সি.-র মৃত্যুদূত লাফাইতে লাফাইতে গিয়া বাসটার উপর পড়িল। মুহূর্ত্তে কি যেন এক ওলট্-পালট্ হইয়া গেল। ও. সি. বাস হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপরেই ও. সি. একেবারে ঘোড়ার পদতলে। তখন তখন ও. সি.-কে হাসপাতাল নিয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার একটি কথায় তাহার সকল কর্ত্তব্য শেষ করিলেন—গত।

এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সঙ্গে মাকে টানিয়া আনা কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। তবে প্রশ্নকর্ত্তা মনে রাখিতে পারেন ইহার বিচারক আমি বা তিনি নহেন। উহার বিচারক তিনি যিনি ব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়া মা, মা বলিয়া কাঁদিয়া ছিলেন এবং পরিত্রাণও মিলিয়াছিল এক অভাবনীয় উপায়ে।

আমি জানিনা ভদ্রলোক ছাত্র-জীবনেই বিবাহ করিয়াছিলেন না প'রে করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও মায়ের দৃষ্টি অব্যাহত নতুবা তাহার বিবাহের সময় মা ভোলানাথকে তাহার বিবাহের বরযাত্রী করিয়া পাঠাইতেন না।

তারপর ভদ্রলোকের সাংসারিক জীবনের প্রারম্ভে বড় ছেলেটি তিন বছর বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয় ছেলেটিরও প্রায় ঐ বয়সে পরিবারটি তাহাকে নিয়া বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা মাকে এ বিষয়ে কিছু মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে মনে একটি নীরব প্রার্থনা পোষণ করিতেছিলেন যাহার ফলস্বরূপ ছেলেটির মা একদিন স্বপ্নে দেখিলেন কে যেন বলিতেছেন—"উদয়াস্ত কালীপূজা কর; তোমাদের বিঘ্ন নাশ হইবে।" ভদ্রমহিলা স্বামীকে ঐ কথা মাকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভদ্রলোক স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি যখন স্বপ্ন দেখিয়াছ তখন তুমিই তাহা মাকে নিবেদন কর—আমাকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া সঙ্গত হইবে না।" মাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানান হইল। মা উদয়াস্ত কালীপূজা দেওয়ার সম্মতি দিলেন। কিন্তু দিবা কালীপূজার পুরোহিত মিলান দুর্ঘট হইয়া পড়িল। ঐ পরিবারের পুরোহিত বলিলেন দিবা কালীপূজা অশাস্ত্রীয়। ভদ্রমহিলা সে সংবাদটিও মাকে পৌঁছাইলেন। মা তখন খুকুনী দিদিকে বিন্ধ্যাচল হইতে কাশীতে পাঠাইলেন এ বিষয়ে কাশীর পণ্ডিতগণের মত নেওয়ার জন্য। (অবশ্য এ বিষয়ে মায়ের কিছুই নূতন করিয়া জানিবার দরকার ছিল না—জানিবার দরকার ছিল পুরোহিত মহাশয়ের; যাহাতে মায়ের কথার উপর তাহার সংশয় না থাকে)। কাশীর পণ্ডিতগণ দিবা কালীপূজার বিধি দিলেন। উহাতেও পুরোহিত মহাশয় দিবা কালীপূজায় সম্মত হইতে পারিলেন না, দিবা কালীপূজায় পূজারীর বংশ লোপ হয় এই আশঙ্কায়। মা তখন ছিলেন ঢাকায়—ঢাকা হইতে ভদ্রলোককে পত্র দিলেন আমি অমুক তারিখ কলিকাতা পৌঁছিতেছি—তুমি শিয়ালদাহ ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবে। মা নির্দ্দিষ্ট দিনে শিয়ালদাহ পৌঁছিয়া ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া ষ্টেশন হইতে সোজা কালীঘাটের কালীবাড়ী গেলেন ও তথায় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, এ শরীরটা কখন মিথ্যা কথা বলে না—এ শরীর তোমাকে কথা দিতেছে—দিবা কালীপূজার জন্য তোমার বংশ লোপ হইবে না।"

(কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—গী ৯।৩১) মায়ের কথায় পুরোহিত মহাশয়ের দ্বিধা কাটিল ও পূজা করিতে সম্মত হইলেন।

মা ঐদিনই বন্ধুবরকে পূজার আয়োজন করিতে বলিয়া ছেলেটির মা ঠাকুরমা ও দিদিমাকে (একুল-ওকুল দুকুল জড়াইয়া) একটি নাম দিয়া বলিলেন, "এ নাম তোমরা পালা ক্রমে অখণ্ডভাবে দিনরাত জপ করিবে যে পর্য্যন্ত কালীপূজা শেষ না হয়।" মা ঐ দিনই পুরী চলিয়া গেলেন এবং যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন পূজার দিন অর্থাৎ জপের সপ্তমদ্দিনে তিনি কলিকাতায় কালীপূজা স্থলে উপস্থিত থাকিবেন।

ঢাকুরিয়া ছোট লেকের নিকট তখন বিড়লার একটি ধর্ম্মশালা ছিল। মা নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া ঐ ধর্ম্মশালায় উঠিলেন এবং মায়ের তত্ত্বাবধানে সেই ধর্ম্মশালার সংলগ্ন শিবমন্দির প্রাঙ্গণে কালীপূজা উদযাপিত হইল।

পূজার দিন বন্ধুবর খুকুনী দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসাদের আয়োজন কি রকম করিব ?" খুকুনী দিদি শত লোকের প্রসাদের আয়োজনের নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রসাদ পরিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিল পিল করিয়া প্রসাদ প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ভদ্রলোক উহা দেখিয়া মাকে গিয়া ভাণ্ডারের একটু সংবাদ দিয়া আসিলেন। তারপর শত লোকের স্থলে কয়েক শত লোক পেট ভরিয়া তৃপ্তির সহিত প্রসাদ পাইলেন। তবু প্রসাদ উদ্বৃত্ত হইল জন বিশে লোকের মত। মায়ের আদেশে উদ্বৃত্ত প্রসাদ বন্ধুবর তাহার বাড়ীতে নিয়া গেলেন।

মায়ের লীলা বরাবরই অদ্ভুত কিন্তু তাঁহার ভক্তের বিশ্বাসটিও কম নয়। ঐ বিশ্বাসের মা একটি সুন্দর নাম করণ করিয়াছেন—সাধনার হিম্মৎ।

এখন আবার আমাদের পূর্ব্ব প্রসঙ্গে আসা যাক। বন্ধুবরের জীবনের একটি ছোট কথা—ওজন দিয়া ইহার মূল্যায়ণ হইবে না,

অনুভূতি দিয়া বিচার করিলে মাতৃভক্ত মায়ের স্নেহের পরশ পাইবেন আশাকরি। সে ১৯৩০।৩১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আজ রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ের নিকট মেলোডি বলিয়া যে দোকানটি আছে তখন ঐ বাড়ীতে থাকিতেন মায়ের ভক্ত শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র বসু মহাশয়। মায়ের আগমনোৎসবে ঐ বাড়ী লোকে ভরপুর। বন্ধুবর মাকে পাইয়াও কেমন যেন একটা না পাওয়ার অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। মাকে বলিলেন, "মা চল একটু নিরিবিলিতে বসি।" মা বিনা আপত্তিতে ছেলের অনুগমন করিলেন। বাড়ীর ছাতে উঠিয়া মা সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়া বিনা আসনে মাটিতে কোল পাতিয়া বসিলেন। ছেলেও কোন কথা না বলিয়া ছোট শিশুর মত সে কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিবেচ্য চিত্ত কতটা নির্ম্মল হইলে ও হৃদয়ে কতখানি ভালবাসা থাকিলে উহা সম্ভব হয়।

বন্ধুবরের স্ত্রী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন—মা বলিতেছেন, "আমাকে তোদের বাড়ী নিয়া চল।" স্বপ্ন সত্য মিথ্যা দুই-ই হইয়া থাকে। স্বপ্ন দ্রষ্টা তাহাকে না পারে ধরিতে না পারে ছাড়িতে। কিন্তু কি জানি কেন ঐ সুখ স্বপ্নটি অন্তর জুড়িয়া বসিল ঐ স্বপ্ন দ্রষ্টার। কয়েকদিন পরেই কহিনূর বাবুদের বাড়ীতে সংযম সপ্তাহ প্রতিপালিত হওয়ার কথা। ঐ উপলক্ষে মা একডালিয়া রোডের আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। ভদ্রমহিলা আশ্রমে গিয়া মাকে তাহার স্বপ্নের কথা বলিলেন। মা বলিলেন, "সামনের বৃহস্পতিবার আমাকে তোর বাড়ী নিয়া চল।" খুকুনী দিদি বলিলেন, "পরমানন্দ গিয়া বাড়ীটা দেখিয়া আসিবে।" মা বলিলেন, "দরকার নাই।" কথা রহিল মাকে নিয়ে আসার জন্য ভদ্রলোককে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ দম্পতি সে বৃহস্পতিবারের প্রতীক্ষায় তিল তিল করিয়া দিন কয়টি কাটাইয়া দিলেন। বৃহস্পতিবারের দিনমানটিও যখন শেষ হইতে চলিল তাহাদের প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ চলিলেন একডালিয়া রোড আশ্রমের দিকে

মায়ের সন্ধানে। ব্রাহ্মণী বসিয়া রহিলেন ঘরে—তাহাদের অনুপস্থিতিতে যদি তিনি আসিয়া যান। ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তার একটা বাঁক ঘুরিতে যাবেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল পশ্চাতে। তিনি ফিরিয়া মায়ের গাড়ীটি দেখিতে পাইলেন—বাঁকটি ঘুরিলে আর তিনি দেখিতে পাইতেন না। (মানব জীবনের প্রত্যেক সন্ধি স্থলে তিনি বোধ হয় এমন করিয়া বাঁশী বাজান)। ব্রাহ্মণ হাঁটিয়া বাসায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মায়ের গাড়ীখানা তাহার বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মা গাড়ী হইতে নামিয়া সামনের দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা না করিয়া খিরকির দরজার সামনে গিয়া, সিঁড়িতে একটি পা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কে তাঁহাকে এপথে চালিত করিলেন তিনিই জানেন। গৃহীর বাড়ীতে মায়ের প্রবেশ স্বামীজীর মনঃপুত ছিল না—তিনি সিঁড়ি বাহিয়া দোতালায় উঠিয়াই স্থানটির পরিবেশ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এখানে মায়ের আসা চলিতে পারে।" (বাড়ীর সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে বাসগৃহ অতিক্রম না করিয়া ভিতরে আসার কোন পথই ছিল না) মা ছোট বড় কাহার মর্য্যাদা কখন লঙ্ঘন করেন না। স্বামীজী পূর্ব্বোক্ত অভিমতটি প্রকাশ করিতে না করিতে মা তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দম্পতির আনন্দের কথা বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিন মাধব মন্দিরে মোর॥

এখন বলিব ভদ্রলোকের একটি আত্মপ্রত্যয়ের কথা। তিনি বলিতে লাগিলেন, শিবেনবাবু সে ১৯৫৭।৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমি আমরা ব্যবসায় নিয়া নানা কারণে বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। মানসিক অশান্তিতে রাতে ঘুম পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। আমার স্ত্রী আমার ঐ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "দিন রাত তুমি ঐরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে কি পাগল হইয়া যাবে? তুমি মায়ের নিকট যাও,

তোমার দুশ্চিন্তার অবশ্য বিরাম হইবে।" স্ত্রীর ঐ কথাটি আমার ভিতর মন্ত্রৌষধের মত কাজ করিল। আমার মনে বল আসিল—তা'হলে আমার জন্য চিন্তা করেন, আমার সকল ব্যধি নিরাময় করিতে পারেন আমার তেমন একজন পরম বান্ধব আছেন। এই সময় একদিন প্রাতে প্রত্যহকার মত বাজারে যাইতেছিলাম। যতীনদাস রোড ও ল্যান্সডাউন রোডের মিলন স্থানে আসিতেই দেখিলাম একখানি মোটর আমার সামন দিয়া ঝড়ের বেগে চলিয়া গেল—উহাতে মা বসা আছেন, চুল মাথার উপরে চূড়ার ছাদে বাঁধা। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া একডালিয়া রোডের আশ্রমে, এস. আর. দাসগুপ্তের বাড়ীতে, আণ্ডার মিত্র, কনক মিত্রের বাড়ী, জ্যোতিষ গুহের বাড়ী অর্থাৎ যেখানে(২) মায়ের আগমনের সম্ভাবনা সর্ব্বত্র খোঁজ করিয়াও কোথাও মায়ের খোঁজ পাইলাম না। আমি কিন্তু আমার দর্শন বিষয়ে ছিলাম নিঃসন্দেহ। তখন আমার স্ত্রী আবার আমাকে পরামর্শ দিলেন, "তুমি ঐরূপ খোঁজাখুঁজি না করিয়া সোজা কাশী চলিয়া যাও।" আমি বিলম্ব না করিয়া কাশী চলিয়া গেলাম। কাশী পৌছিয়া পুরাণ আশ্রমের দ্বিতলে মায়ের দর্শন পাইলাম। মা আমাকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তখন দিদি, বুনী, নারায়ণ স্বামী মায়ের নিকট বসা ছিল। মা কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসান্তে আমাকে বলিলেন, "এখন গিয়া স্নানাহার কর, পরে অন্যান্য কথা হইবে।" আমি বলিলাম, "না মা, তাহা হইবে না—আমি একটি প্রশ্ন নিয়া আসিয়াছি উহার উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি স্নান আহার করিতে পারিব না।" ঐ কথা বলিয়া আমার দর্শনের কথা বলিলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার দর্শন সত্য না কল্পনা প্রসূত ?" মা তখন নানা কথা বলিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি এই শরীরটা দেখিয়াছ না ইহার মত অন্য একটা শরীর দেখিয়াছ ? আবার বলেন, "সেটা প্রাইভেটকার ছিল না ট্যাক্সি ছিল ?" আবার জিজ্ঞাসা করেন, "ঐ কারে আর কাহাকে কাহাকে

দেখিলে? তুমি স্পষ্ট এই শরীরটা দেখিয়াছ ত'।" তখন আমি একটু দৃঢ়তার সহিতই বলিলাম, "এখানে বসিয়া আমি আমার শরীরটা যেমন স্পষ্ট দেখিতেছি, তোমাকেও সেদিন তেমন স্পষ্ট দেখিয়াছিলাম।" এবার নারায়ণ স্বামীর পীড়া-পীড়িতে মা বলিয়া ফেলিলেন, "ও যাহা দেখিয়াছে ঠিক দেখিয়াছে—এ শরীরটা কলিকাতা গিয়াছিল ওকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া।" নারায়ণ স্বামী ঐ কথা শুনিয়া আনন্দে এমন চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল আজও যেন তাহা আমার কাণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আত্মপ্রত্যয় সাধনের একটি মূল্যবান সামগ্রী—অগ্রগতির এক বলিষ্ঠ অবলম্বন।

এই পরিবারের আর একটি আনন্দের কাহিনী বলিয়া আমি আমার এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বিদুরের গৃহিনী ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আপন আলয়ে পাইয়া প্রেম বিবশ চিত্তে কলা ফেলিয়া কলার খোসা তুলিয়া দিয়াছিলেন তাহার কর কমলে। ভগবানও উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন হাসিমুখে। সে বিদুর গৃহিনী আর সে ভগবান আবার কবে আসিবেন না আর কোনদিনই আসিবেন না জানিনা। কিন্তু প্রেমের ধারা কখন লোপ পায় না। মা কোন এক উৎসব উপলক্ষে আর একদিন আসিয়াছিলেন এই বন্ধুবরের গৃহে। বন্ধুবরের স্ত্রী তাহার সকল ভালবাসা দিয়া পীঠা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিলেন মায়ের জন্য। বাড়ীতে লোক ধরিবে না বলিয়া বাড়ীর সামনে একটি সায়মানাও খাটান হইয়াছিল। উৎসব আয়োজনের ত্রুটি কোথাও ছিলনা কিন্তু সকল আয়োজনের ভিতর ভদ্রমহিলা মাকে পীঠা খাওয়াইতেই ভুলিয়া গেলেন। তাহার সে কথা মনে পড়িল মা চলিয়া যাওয়ার পর। তিনি ত' তখন কাঁদিয়া আকুল। ভদ্রলোক সে পীঠা নিয়া তখনই ছুটিলেন। মা তখন ছিলেন ত্রিকোণ পার্কের নিকট নির্ম্মলবাবুর বাড়ী। মা তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বুঝছি, বুঝছি—খাওয়ার নিয়া আসছ, আমার ত' ঐ কথাই মনে

হইতেছিল—দাও দাও কি নিয়া আসছ।" মায়ের লীলার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য দুইটিই সমতুল্য।

——o——

(১২)

উপসংহারটি "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু ব্যথার পর প্রলেপ যেমন মধুর হয় তেমন বোধ হয় অন্য সময় হয় না। সবল সুস্থ সন্তানের পক্ষে মায়ের আদর যতটা উপভোগ্য হয় রোগক্লিষ্ট দুর্ব্বল শিশুর উপভোগের মাত্রাটি তদপেক্ষা অধিক হয়। শশধরদার নিকট শুনিয়াছিলাম মা February (1975) মাসের ১৯শে তারিখ কলিকাতার Sunny Park না কোথায় এক ভক্তের বাড়ী তাহার গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে আসিবেন। শুনিয়া একটু আনন্দও হইয়াছিল কিন্তু সে আনন্দটা ছিল যেন গরীবের ঘরের দুর্গোৎসবের মত—সাধ আছে সামর্থ্য নাই। Sunny Park কোথায় জানা নাই এবং জানা থাকিলেও Tram বা Bus-এ গিয়া মাতৃদর্শন আমার শক্তির বাহিরে। সুতরাং মাতৃদর্শন বিষয়ে সতৃষ্ণ হইলেও অনেকটা নিশ্চেষ্টই রহিলাম।

১৯শে February বৈকালে ৫ টার সময় সুখময়বাবু Taxi নিয়া আমার বাসায় হাজির—শিবেনদা; চলুন আমরা মাকে দেখিতে যাইতেছি বেহালায় (স্থানটা ঠাকুর-পুকুর ও আমতলার মাঝে—নাম ভাষা)। মা তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে গিয়া ভাষায় হাজির হইলাম। সে ছিল বিভূতি ব্যানার্জী মহাশয়ের বাগান বাড়ী বেশ শান্ত পরিবেশ। ওখানে নাকি মৃত্যুকবলিত এক হরিণ শিশু মায়ের পথ পানে তাকাইয়াছিল। যাক্ আমি সাধারণতঃ ভীড় ঠেলিয়া কখন মায়ের নিকট বসিতে চেষ্টা করি না। আজ এখানে সে নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইয়া গেল কেননা আমার পশ্চাতে ছিলেন সুখময়বাবু, তাহার স্ত্রী, পরেশবাবু ও তাহার স্ত্রী; তাহারাই আমাকে pressure দিতে

লাগিল। এমন সময় শ্রীযুত রণজিৎ ব্যানার্জী আমার হাত ধরিয়া নিয়া এমন একটি জায়গায় বসাইয়া দিল যে সেখান হইতে মাকে দেখার কোন বাধা রহিল না। মায়ের চিরহাস্য মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। এক ভদ্রলোক বলিলেন মা আপনার পানে তাকাইয়া ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আমি নতজানু হইয়া প্রণাম করিতেই অবিশ্রান্ত নাম চলিতেছিল—তারপর অন্য চাওয়া পাওয়ার কোন কথাই আমার মনে জাগে নাই। সুখময়বাবু যেমন আমাকে নিয়া গিয়াছিলেন তেমন বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। এ পরিবারের নিকট আমি চির ঋণী।

এবার শুনুন কল্যাণময়ীর কল্যাণ হস্তের প্রলেপের কথা। ২৩শে ফেব্রুয়ারী সুখময়বাবুর স্ত্রী আগারপাড়া আশ্রমে মাকে দেখিতে যান। ইতিপূর্ব্বে January মাসে তাহাদের বাড়ী যে নাম যজ্ঞ হয় সেই নাম যজ্ঞের যজ্ঞপুরুষের ধুতিখানা তিনি মায়ের জন্য রাখিয়া দেন। ইচ্ছা ঐ কাপড়খানা নিজ হাতে মায়ের অঙ্গে একবার জড়াইয়া দিবেন তারপর মা উহা ব্যবহার করুন বা কাহাকেও দান করুন তাহা তাঁহার ইচ্ছা। ভদ্রমহিলা মাকে সামনে পাইয়াও সেদিন সেখানকার বাধা নিষেধ অতিক্রম করিয়া তাহার সে সাধ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করিয়া হয়রাণ হইয়া নির্ব্বাণনন্দের উপদেশ মত মায়ের অজ্ঞাতে ঐ কাপড়খানি মায়ের পাশে রাখিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। গঙ্গারতীরে বসিয়া তাহার কি কান্না, কতই ভাবনা—তাহার অপরাধ কোথায় যে অপরাধের জন্য মা তাহার হাতের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন না, সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি গঙ্গায় ডুবিয়া মরা, ইত্যাদি। ২৩শে February আমি তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখি ভদ্রমহিলা কাঁদিয়া চোখ-মুখ ফুলাইয়াছেন তবু তাহার দুঃখের উপশম হয় নাই। আমার কিন্তু ঐ দৃশ্য দেখিয়া একটু আনন্দই হইয়াছিল ; সান্ত্বনা দেওয়ার কোন চেষ্টাই আমি করি নাই কেননা ভগবান যে ঐরূপ অশ্রুমুখী

নারীকেই ভালবাসেন। ২৪শে February আবার ভদ্রমহিলার সাথে দেখা করিয়া প্রথমই জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাতে কোন স্বপ্ন দেখিলেন কি? ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন, "না শিবেনদা, এ জীবনটা বৃথাই গেল।" তখনও তাহার কান্নার বিরাম হয় নাই। আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ ছিলাম ও কান্না কখন বৃথা যায় না। তাই পরের দিন গিয়া আবার তাহাকে একই প্রশ্ন করিলাম, "স্বপ্নে মা দেখা দিয়াছিলেন কি?" আজ ভদ্রমহিলার মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি দেখিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, "শিবেনদা, কাল স্বপ্নে দেখি —কোথায় যেন গিয়াছি, মা সেখানে বসা আছেন আর আমার ছেলে খোকন মায়ের পায়ে মালিশ করিতেছে। আমি খোকনের দেখাদেখি মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম—আমার বাম হাতটা দিয়া কেননা আমার ডান হাতটা অপেক্ষাকৃত শক্ত। মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে দেখি মায়ের পায়ের পাতাটি অস্বাভাবিক নরম—যেন তুল তুল করিতেছে। তখন মায়ের পায়ের একটা আঙ্গুল মটকাইয়া দিতেই দেখি কি ঐ আঙ্গুলটা হইতে গঙ্গার ধারা বহিয়া চলিয়াছে।"

আমি বলিলাম, আগরপাড়ার গঙ্গায় ডুবিয়া আপনার মরা হইবে না ভাগ্যে আছে গুরুগঙ্গায় ডুবিয়া যাওয়া।

যে প্রেমে হাসি-কান্না নাই, মান-অভিমান নাই, সে প্রেমে প্রেমিকের মন মজেনা। গোবিন্দ ভক্তের চোখের জল ঘোচান না, মোছান।

—o—

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হইবে
১	১০	ঘটনাশব্দের পরে	একত্রে
৩	১	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ
৫	২১	হারান	হারাণ
৭	৬	হকচাকিয়া	হকচকিয়া
২৮	২	Missionery	Missionary
৯	১১	নিই	নেই
৪৯	৮	দেয় নাই	দেই নাই
৫৩	২৪	জানিও	জানিয়া
৫৬	১৮	জীতেন	জিতেন
৬০	১০	সমাধিম	সমাধিমগ্না
৬৭	১	যু কটি	যুবকটি
৬৭	২, ৩	কীর্ত্তন সঙ্গীতে	কীর্ত্তনের সঙ্গে
৭২	১৭	ত্রায়তো	ত্রায়তে
৭৩	১৬	অসস্তি	অস্বস্তি
৮৬	২, ৭, ৭	পৌঁছাইয়া	পৌঁছিয়া
৯৭	৩	লিতেছি	বলিতেছি

—o—

লেখকের অপরাপর পুস্তক ঃ

সত্যপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ

আপন মনে (যন্ত্রস্থ)

আপন গানে (যন্ত্রস্থ)

পাণ্ডিত-শ্রীশ্রীহর্ষা-মোহন

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীসুখময় চক্রবর্ত্তী

৫১৮/বি, যোধপুর পার্ক,

কলিকাতা-৬৮

মূল্য ঃ ২.৫০